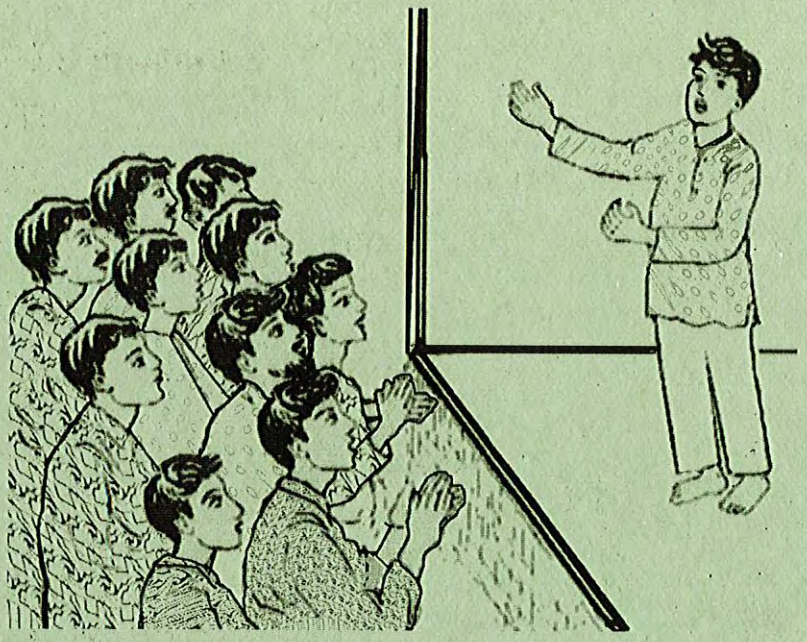
৪০১। আব্বাসউদ্দীন

একটা ছেলে ছিল, তার নাম আব্বাস। ছয় বছর বয়সে সে ক্লাস ওয়ানে পড়ত। একদিন স্কুলে একটা অনুষ্ঠান হল। পুরো এক মাস রিহার্সেল চলেছিল। আব্বাস সব সময় চুপ করে দেখত, চুপ করে শুনত। তাকে একটা রোল দেওয়ার কথা কেউ ভাবেনি। সে গুণ গুণ করতে করতে বাড়ি যেত, বাড়ি গিয়ে বাবা-মাকে গান শুনাত। অনুষ্ঠানের দিন সারা গ্রামের লোক দেখতে আসল। গায়কদের মধ্যে একজন ছিল, তার গলা খুব মিষ্টি। অনুষ্ঠানের চারটি গান তার গাওয়ার কথা । কিন্তু সেদিন



হঠাৎ মানুষের এত ভীড় দেখে সে ভয় পেয়ে গেল, এমন কি, কাউকে কিছু না বলে স্কুল থেকে পালিয়ে গেল। তাকে খুঁজে বের করার সময় ছিল না। মাস্টাররা কি করবে তা ভেবে কূল পাচ্ছিল না। তখন ছোট আব্বাস হেডমাষ্টারকে গিয়ে বলল, আমি গান গাইব, পরীক্ষা করে



দেখুন আমি
পারি কি না।
হেড মাষ্টার
তাকে
পাত্তাই দিল না।
এইটুকু বাচ্ছা
কি আর গাইবে!
কিন্তু গানের
মাষ্টার বলল,
পরীক্ষা করে

দেখি, আমাদের তো আর কোন উপায় নেই। প্রথম গানের কয়েকটা লাইন শুনে বলল, অনুষ্ঠান শুরু করা হোক। সেদিন ঐ ছোট ছেলেটি স্টেজে উঠলে সবাই নীরব হয়ে রইল। তার প্রত্যেকটি গানের শেষে শ্রোতারা হাততালি দিয়ে ঘর কাঁপিয়ে দিল। তার মত কণ্ঠ, তার মত ভাব নিয়ে গান করে, এমন কোন শিশুকে তারা জীবনে দেখেনি। সেই যে আব্বাস স্টেজে উঠল, আর নামেনি। সারা জীবন গান গেয়ে গেল। আব্বাসউদ্দিন শিল্পীর গান আমরা সবাই শুনেছি।

৪০২। আলোরেখা

গ্রীস দেশে এক রাজকন্যা ছিল, তার নাম আলোরেখা। একদিন যখন তার বয়স দু' বছর হল তখন তিনজন চাকরের সঙ্গে তাকে পাহাড়ি পথে মামার বাড়িতে পাঠানো হল। পথে তারা দস্যুদের হাতে পড়ল। দস্যুরা চাকরদের মেরে টাকা-পয়সা নিয়ে এক খাদের মধ্যে ফেলে দিল। শিশুকে পথের ধারে ছেড়ে দিল।

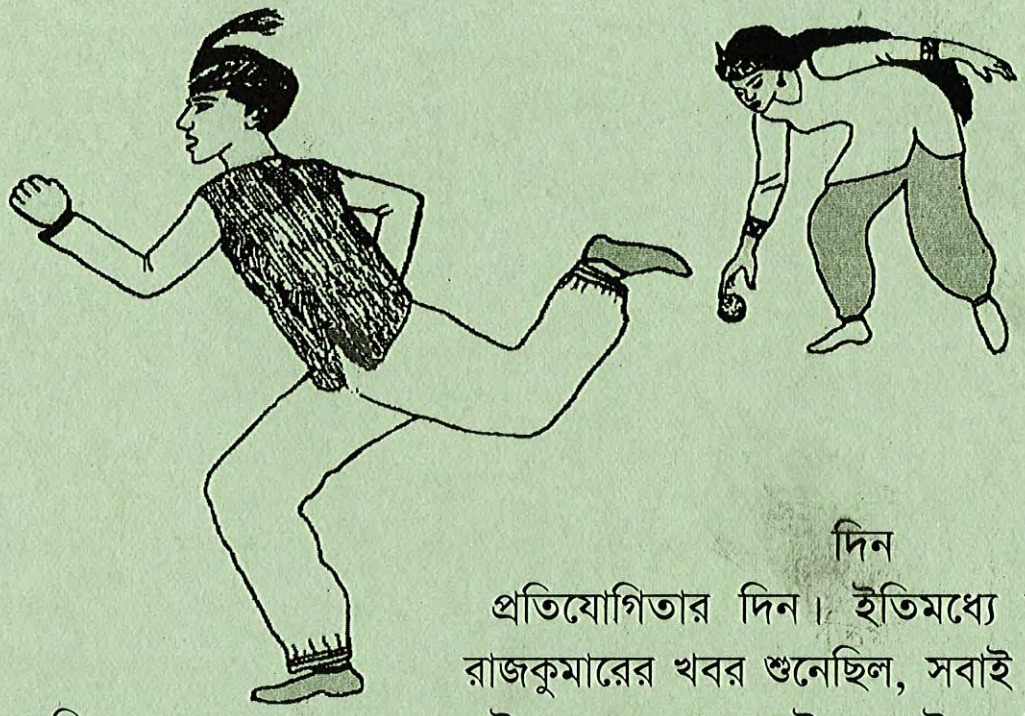
সৌভাগ্য যে ঐ পথ দিয়ে এক রাখাল তার মেষের পাল নিয়ে গেল। বাচ্চাকে তুলে নিয়ে তার স্ত্রীকে দিয়ে বলল, খোদা পাঠিয়েছেন, এটা আমাদের মেয়ে।



এভাবে মেষ ও মেষপালকদের মধ্যে আলোরেখা বড় হতে লাগল। পাহাড়ের গায়ে দৌড়াতে দৌড়াতে তার হাত পা এত চালু হয়ে গেল যে

বলল, আমার মেয়ের সঙ্গে পাল্লা দিলে সে কাউকে মায়া-দয়া দেখাবে না। তবে একটা জিনিষ আছে, তার মায়া সে কাটাতে পারবে না। নাও, এই তিনটি কমলা নিয়ে যাও। তোমার কাজে লাগবে।

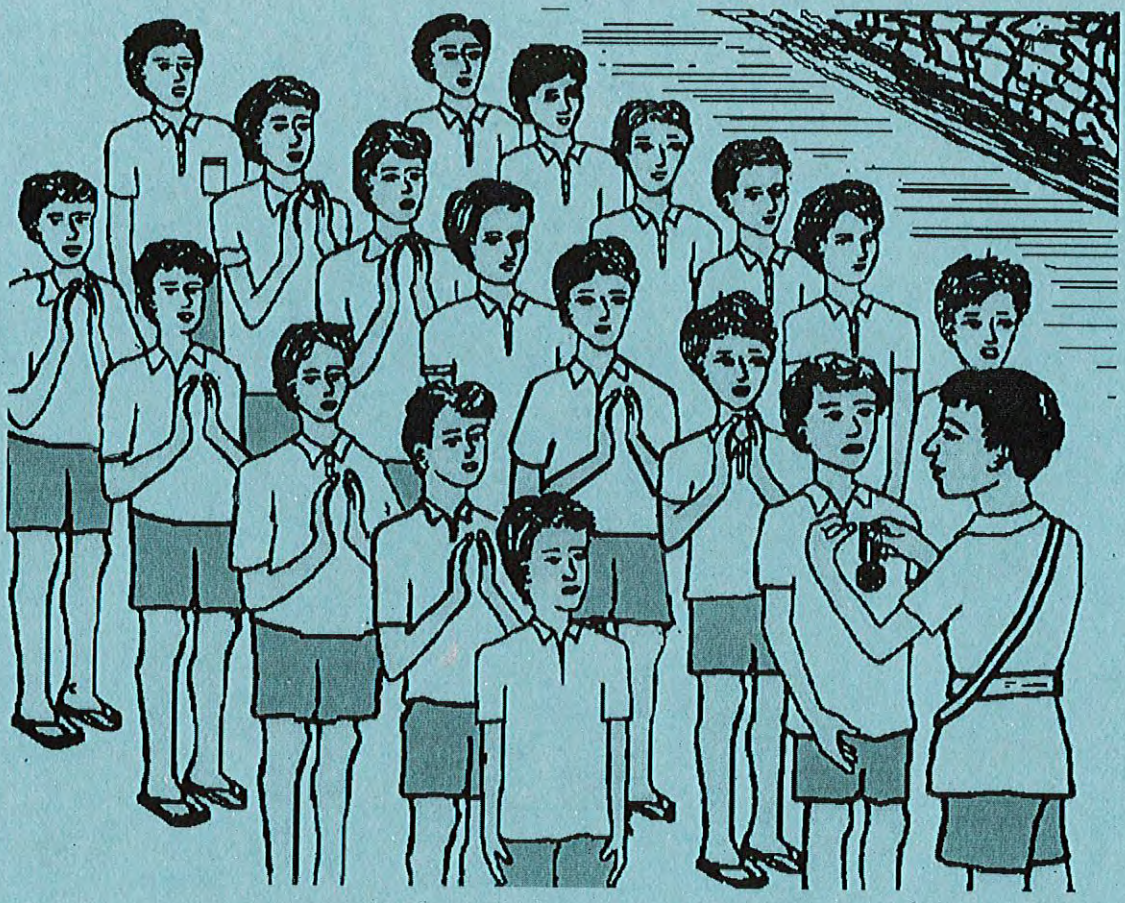
পরের



দিন ছিল প্রতিযোগিতার দিন। ইতিমধ্যে সবাই রাজকুমারের খবর শুনেছিল, সবাই আশা করছিল তার জয় হবে। মেয়েটাও মনে মনে সেই আশাই করছিল। এদিকে হেরে যেতেও সে চাচ্ছিল না।

প্রতিযোগিতা শুরু হলে ছেলেটা কিছুক্ষণ মেয়েটির পাশাপাশি দৌড়াতে লাগল, কিন্তু মাঝ পথে পিছিয়ে পড়তে লাগল। তখন হঠাৎ তার কোমরে বাঁধা একটা কমলা বের করে মেয়েটার সামনে ফেলে দিল। মেয়েটা কমলা কুড়িয়ে নেবার জন্য থেমে গেল। তারপর কিন্তু আবার দ্বিগুণ বেগে দৌড়ে এসে ছেলেটাকে অতিক্রম করে গেল। তখন সে আর একটা কমলা বের করে মেয়েটার পথের পাশে ফেলে দিল। মেয়েটি পথ ছেড়ে কমলা কুড়িয়ে নিয়ে আবার রাজকুমারকে ধরে

৪০৩। আমাদের খাল



আমাদের খালের মত বিখ্যাত খাল সারা দেশে আর নেই। বিশেষ করে যে অংশটা আমাদের গ্রাম শিমুলিয়া থেকে বেরিয়ে আমতলা গ্রামে প্রবেশ করেছে সেইটুকু। সেই অংশটা বেশী লম্বা নয়, কুড়ি হাতের মত। আমরা অনেক দিন আগে সেটা দখল করেছিলাম। এখন সেটা রাখার জন্য শিমুলিয়ার প্রতিটি ছেলে প্রাণ পর্যন্ত দিতে রাজি। সেই অংশটা আমাদের বাপ-দাদাদের ন্যায্য সম্পদ। ওটাকে হারালে তারা কবরেও শান্তি পাবে না। গত বছর পর্যন্ত দুই গ্রামের ছেলেদের মধ্যে রোজ ঝগড়া হত। তারপর একদিন দুই দলের মধ্যে একটা মীমাংসা

বার আমাকে বলত, আমি কোনদিন ক্যাপ্টেন হব না বুঝি ?

প্রত্যেক লড়াইয়ের আগে দুই পক্ষের দল বার বার মিলিত হত যুদ্ধের কলাকৌশল ঠিক করার জন্য ও প্রত্যেকের দায়িত্ব নির্দিষ্ট করার জন্য। তখন একদিন শামীম এল না। কেউ খেয়াল করল না। পরের দিন কিন্তু সে এসে বলল, এবার আমাদের খুব সাবধান থাকতে হবে। ওরা বালির ঢেলার একটা স্তূপ এক জায়গায় লুকিয়ে রেখে আসবে। শেষ মুহূর্তে আমাদের ঢেলা ফুরিয়ে গেলে ওগুলো বের করবে।

আমরা সবাই অবাক। শামীম বলল, ওরা কালুদের বাড়িতে মিটিং করেছে, অনেক রাত পর্যন্ত। আম গাছে উঠে আমি সব শুনেছি। আমি বললাম, কোথায় ঢেলা লুকিয়ে রাখবে সে খবর আনতে পারবে ? শামীম বলল, পারব।

দুই দিন পর লড়াই হল। ওদের ঢেলা চূর্ণ-বিচূর্ণ করার জন্য আমাদের দু'জন বীর, সালাম ও আক্তারকে পাঠিয়ে দিলাম। আমতলার ছেলেরা কিন্তু যখন দেখল তাদের সব পরিকল্পনা মাটি হয়ে গেছে তখন খেপে গিয়ে এত দুর্দান্ত হয়ে উঠল যে, আমাদের দল পিছু হটতে শুরু করল। প্রতি মুহূর্তে শত্রুদের সাহস বেড়েই চলছিল আর আমাদের সাহস কমে যাচ্ছিল। দুই-তিনজন পালাতে শুরু করল। আমি তাদের ভয় দেখালাম, তবু থামাতে পারলাম না। চোখে অন্ধকার দেখলাম। পরাজয় কাকে বলে তা জানতাম না। এবার বুঝলাম হেরে যাওয়া কাকে বলে। তখন হঠাৎ যা অসম্ভব তাই ঘটে গেল। ছোট শামীম খাটে শুয়ে ছিল। ডাক্তার বলেছে, দুই রাত গাছে থেকে থেকে ঠাণ্ডা লেগে নিউমোনিয়া হয়েছে। শামীম যখন বুঝল তার দল হেরে যাচ্ছে তখন জ্বরে প্রলাপ বকতে বকতে বারান্দা থেকে নেমে এল। যারা পালাচ্ছিল তাদের দিকে এমন ভাবে তাকাল যে তারা ভয় পেয়ে গেল।

৪০৪। আশ্চর্য প্রদীপ ১

আরব দেশে খুব অভাবের দিন যাচ্ছিল। আলাউদ্দিন ও তার মা খুব গরিব। তারা পরের বাড়িতে কাজ করে, খেয়ে না খেয়ে দিন কাটায়।



আলাউদ্দিনের বয়স এখন বিশ বছর। একদিন সে কাজ করে বাড়ি এসে দেখে মায়ের মুখ অন্ধকার।

• মা, তোমার মুখ অন্ধকার কেন?

• অন্ধকার হবে না? তোমার মত সুন্দর ছেলে সারা দেশে আর নেই, তবু বিয়ে দিতে পারছি না। সবাই বলে, ম্যাট্রিক পাস না হলে মেয়েকে খেতে দেবে কি ? পোড়া কপাল আমার!

সে কি! তুমি আবার আমার বিয়ের জন্য খালেকদের বাড়িতে গিয়েছ? আমি তোমাকে বলিনি, ওদের মেয়েকে বিয়ে করব না? আমি নূরজাহানকে বিয়ে করব!



• হায় রে, আমার পোড়া কপাল! রাত্রে কি খাবে তার ঠিক নেই, আর সে কি না রাজকন্যাকে বিয়ে করবে!

তুলব। পাজি! হতচ্ছাড়া! বেয়াদব কোথাকার!



• আপনি রাগ করছেন কেন? প্রদীপটা চান তো আমাকে উঠিয়ে নিন!

• চাচা আবার আলাউদ্দিনকে গালাগালি দিতে শুর করল। গালাগালি দিতে দিতে দশ মিনিট পেরিয়ে গেল। তখন হঠাৎ গুহার মুখটা আপনা আপনি চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে গেল। আলাউদ্দিনের মাথার উপর ঘোর অন্ধকার নেমে এল। তখন আলাউদ্দিন কেদেঁ ফেলল,



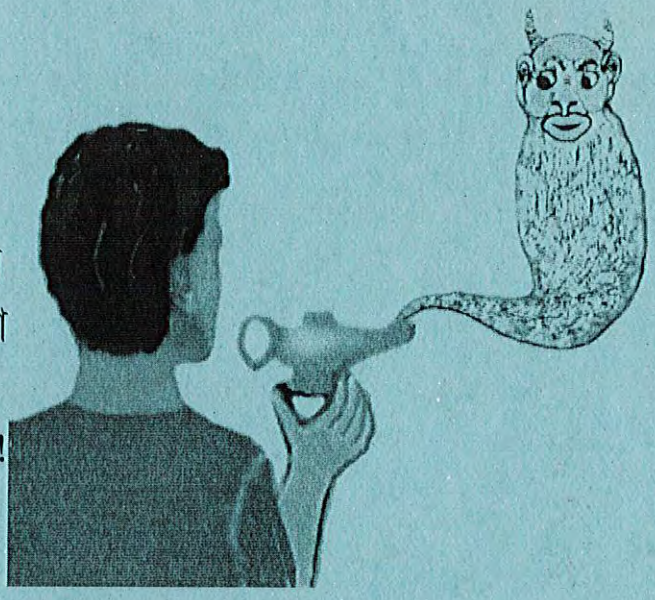
• বাপরে বাপ! গুহাটা বন্ধ হয়ে গেল যে! এখন কি হবে? ও মা গো... ও সোনার মা আমার, আমার জন্য তুমি কত কষ্ট করেছ, আর আমি তোমাকে কোন সুখ দিতে পারলাম না...। হায় রে, আমি মরে গেলে তুমি কত কষ্ট পাবে মা গো..... আর নূরজাহান, তুমিও কত কষ্ট পাবে! তোমার সঙ্গে আর কোন দিন দেখা হবে না... তারার মত সেই দুটি চোখ আর দেখতে পাব না... মেঘের মত তোমার সেই কালো চুল আর দেখতে

৪০৫। আশ্চর্য প্রদীপ ২

আলাউদ্দিন সাহস করে দৈত্যকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কে...?

• আমি তোমার বন্ধু, আর আমি খুব শক্তিশালী, তুমি যা চাও আমি তাই দিতে পারি।

• তাহলে আমাকে মায়ের কাছে নিয়ে যাও।

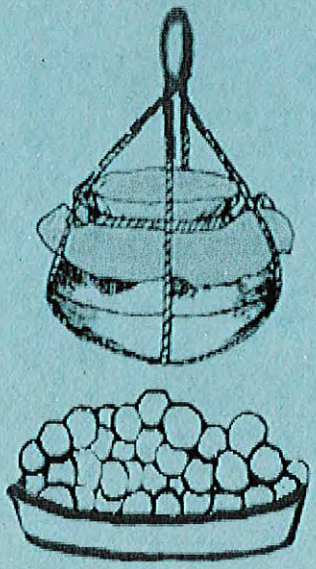


• আচ্ছা, চল।

• এক নিমেশে আলাউদ্দিন বাড়ি এল। এসে দেখে, মা কাঁদছে।

• খোকন সোনা আমার! গতকাল তোমার ফিরে আসার কথা ছিল। সারা রাত আমি ঘুমাতে পারিনি, দেরি করলে কেন বাবা?

• সে অনেক কথা মা, এ সব এখন থাক...



• আচ্ছা বাবা, হাত মুখ ধুয়ে এস, ভাত দিচ্ছি।

• না মা, আজ আমিই তোমাকে খাওয়াব। বন্ধু, দয়া করে তিনজনের জন্য পোলাও, দই আর রসগোল্লা নিয়ে এস। তারপরে মায়ের জন্য ও আমার জন্য মনি-মুক্তা খচিত পোষাক তৈরী করে আন...

মা চোখ মোটা করে ভাত খেতে লাগল। শেষে ছেলেটা বলল, মা, এবার চল, খলিফার কাছে যাই, আমার সঙ্গে তার মেয়েকে বিয়ে দেবে কি

রাজকন্যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে।

• মহারাজ, আমি রাজি... তবে সেই প্রাসাদে আপনার কন্যা বসবাস করবে। যদি সে পছন্দ না করে তাহলে আমার কাজ বৃথা হবে। দয়া করে তাকে ডেকে আনেন, আমি তার কাছ থেকে শুনব কি ধরনের প্রাসাদ তার পছন্দ হয়।

• তুমি বুদ্ধিমানের মত কথা বলেছ বাবা। উজির সাহেব, আমার কন্যা নূরজাহানকে আমার কাছে আসতে বল। নূররজাহান দরজার পিছনেই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হল।

• আব্বাজান, আমাকে ডাকছেন?

• হ্যাঁ মা। তুমি কি এই যুবককে চেন?

• চিনি আব্বা, ছোটবেলা থেকে।

• সে প্রতিজ্ঞা করেছে আজ রাত্রের মধ্যে তোমার জন্য একটা প্রাসাদ তৈরী করবে। সেটা নিয়ে তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চায়। কথা বল যুবক।





• রাজকন্যা, তুমি শিশুকালে সাদা পাথর ভালবাসতে।

• আমি এখনও বাসি। সাদা পাথর দিয়ে প্রাসাদ তৈরী কর।

• তুমি ঝর্নার পানি দিয়ে খেলতে ভালবাসতে...

• আমি এখনও বাসি। আমাদের প্রাসাদে যেন একটা ঝর্না থাকে।

• তুমি প্রত্যেক দিন তিনজন গরীব মানুসকে ডেকে ভাত খাওয়াতে।

৪০৬। বাবার জন্য উপহার।



আলীর বয়স বার বছর। সে ক্লাস সিক্সে পড়ে। ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত সে পড়েছে তার গ্রামের প্রাইমারী স্কুলে। তখন সে স্কুলে যেতে ভালবাসত, তার অনেক বন্ধুবান্ধব ছিল, মাস্টাররাও তাকে ভালবাসত, ভাল ছাত্র বলে। কিন্তু হাই স্কুলে ভর্তি হলে তার মনে হল সে যেন একটা মাটির হাড়ি, তার চারপাশে শুধু লোহার হাড়ি, তাদের মাঝে দ্রুত গতিতে যাত্রা করতে হচ্ছে। বিকালে বাড়ি ফিরে এলে বাবাকে বলে, বাবা, ঐ সব উল্লুকের সঙ্গে আমি স্কুলে থাকতে পারব না। হয়তো আর একটা স্কুলে আমাকে ভর্তি করে দাও, নয়তো স্কুল ছেড়ে দেব!

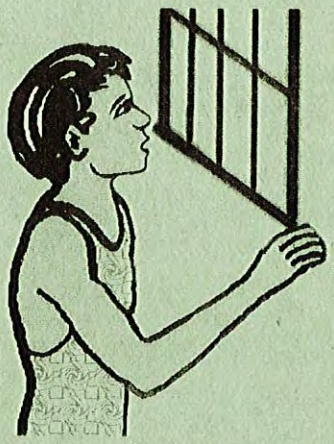
তারপরে কিন্তু এক সময় ছেলেদের মধ্যে দুই একজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করল। তখন থেকে আর স্কুল ছেড়ে দেওয়ার কথা বলল না। সে সময়ে একদিন দুপুরের ক্লাসে স্যার এল না, তখন আলী এক বন্ধুকে বাবার অফিস দেখাতে নিয়ে গেল।

• চল নজরুল, বাবা পৌরসভায় কাজ করে। এক ঘন্টার ভিতরে যাব আসব।

আলীর বাবা তখন অফিস বন্ধ করছিল।

• আব্বা, নজরুল আমার বন্ধু, আমি তোমার অফিস দেখাতে নিয়ে আসলাম।

• আরে, তুমি বুঝতে চাও না কেন? তার বন্ধুর কাছে ওকে ছোট করতে চাই নি। আর তা ছাড়া... ছেলেমেয়েদের জন্য বাবা-মা দু'একটা বোকামি তো করবেই। কেন, তুমি কর না?



আলীর মাথায় যেন বাজ পড়ে গেল! আস্তে আস্তে সরে পড়ল, বাবা যেন টের না পায়। তবে সেই রাত্রে আলীর ঘুম হল না। শুধু ভাবতে লাগল, আব্বা কেন তাকে এই কথা বলে নি?...

এই ঘটনার পর দশ বছরের বেশি কেটে গেল। আলীর তিনটি ভাইবোন ছিল। তাদের সকলকে মানুষ করতে করতে বাবার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যেতে লাগল। গত মাসে ডাক্তার বলেছে তার হৃদপিন্ড বেশি দিন টিকবে না। এই কথা শুধু বাবা জানে আর আলী জানে। এখন আলী প্রাইমারী স্কুলে মাস্টারী করে।



এক দিন আলী বাবাকে বলল, আব্বা চলুন, বাজার করে আসি। পিছনে উঠুন, আমি সাইকেল চালাই।

পাঁচ বছর হল, বাজারে এক নতুন ধরনের সাইকেল উঠেছে, মোটা টায়ার, ছোট চাকা, নরম সীট, চড়তে খুব আরাম। বাবা এক দিন সেই সাইকেলটা এক বার চড়ে বলেছিল, দেখ আলী, বড়লোক হলে আমি ঐ সাইকেলটা কিনব।

৪০৭। ভীতু মায়ের ছেলে



• একটা ছোট মেয়ে ছিল, হালিমা তার নাম। সে গল্প শুনতে ভালবাসত। প্রত্যেক দিন দাদীকে বিরক্ত করত।

• দাদী আমি গল্প শুনব।

• মাথায় আর কোন গল্প আসছে না। যাও।

• কেন! তিনটি ভূতের গল্পটি বল না...

• সে কি! সেই গল্প তো কালকেই শুনলে।

• আবার শুনব দাদী। বল না!...

• আচ্ছা, চুপ করে বস। সাত সমুদ্র চৌদ্দ নদীর ও পারে...

• না দাদী, ভুত ছিল সাত সমুদ্র তের নদীর ও পারে।

• ও, তাই তো, সাত সমুদ্র তের নদীর ও পাড়ে ছিল তিনটি ভূত। তারা বাস করত একটা কালো গুহার মধ্যে। তাদের মাথা ছিল না, টুপি ছিল। একজনের টুপি ছিল লাল, আর একজনের টুপি ছিল নীল আর তৃতীয় টুপি ছিল... সাদা

• না দাদী, তৃতীয় ভূতের টুপি ছিল হলুদ।

• ও! তাইতো, তৃতীয় টুপি হলুদ। এক দিন ভুত সম্রাট সভা ডাকল...

এই ভাবে ভূতের গল্প শুনতে শুনতে হালিমা ভূতের কথা বিশ্বাস করতে শিখেছিল। জীন ভুতের ভয়ে রাত্রিবেলা উঠানেও বের হত না। সবাই তাকে ঠাট্টা করত। দিন যায়, বছর যায়, হালিমা বড় হতে লাগল। কিন্তু

তো ভাবি?

• না, না, আমি বলতে যাব কেন!

আর একটু সামনে যেতে, নদীর ধারে হিন্দুদের শ্মশান। হালিমা কত বার শ্মশানের ভূতের কথা শুনেছে। সেখানে না কি মরা মানুষ চলাফেরা করে ও সন্ধ্যের পর দেখা দেয়। জায়গাটা পার হবার জন্য হালিমা তাড়াতাড়ি পা চালাচ্ছে, এমন সময় তার ডান পাশে চেয়ে দেখে, রহিম আর নেই। ভয়ে হালিমা পাথর হয়ে গেল। ডাকবার সাহস নেই, মুখ খুলতেও পারছে না। প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় সেখানে দাড়িয়ে রইল। দুই মিনিট পরে ছেলেটা রাস্তায় ফিরে এল। বলল, না, আজ ওরা কাউকে পোড়ায় নি। যখন মানুষ পোড়ায় তখন অনেক জিনিষ পাওয়া যায়। চল ভাবি, বাড়ি যাই, আমার খিদে পেয়েছে। তা... ভাবি, তোমার সঙ্গে বেড়াতে আরাম আছে। তুমি অন্যান্য মেয়েদের মত না। তারা শুধু জ্বীন ভূতের ভয় দেখায়।

• হা, হা, হা! দোয়া করি বড় হও ভাইয়া! তোমার এ কথা চিরকাল আমার মনে থাকবে!

• এই ঘটনার পর সাত বছর কেটে গেল। এর মধ্যে হালিমার এক ছেলে হয়েছে। এখন তার বয়স ছয় বছর। সে স্কুলে যায়। এক দিন স্কুল থেকে ফিরে এসে মাকে ধরে।

• মা, বকুল আর মিনা কি বলে জান? বটগাছের উপরে নাকি জ্বীন ভুত বাসা বেঁধে রয়েছে! ওখানে উঠলে নাকি ওরা ধরে।

• ওরা তোমাকে ঠকাচ্ছে। আজ রাত্রে আমার সঙ্গে চল, সত্য কথা জানতে পারবে।

• সত্যি সত্যি রাত হয়ে গেলে মা ও ছেলে দুজনে গেল। হালিমার বুক ভয়ে থর থর করে কাপে। তবু সে বটগাছের তলে গিয়ে ছেলেটাকে উঠতে সাহায্য করে। একটা পেঁচা ফুরৎ করে উড়ে চলে যায়। ছেলেটা

৪০৮। ভূতের বাচ্চা



আবুর মত দুর্ভাগা ছেলে জগতে আর নেই। এই বছরে অতিরিক্ত গরম পড়ে আম-কাঁঠাল অনেক আগে পেকে যাচ্ছে। ছুটির সময় মামার বাড়িতে গেলে আর কিছু পাওয়া যাবে না। পনের দিন আগে ছুটি হলে সব ঠিক হয়ে যেত। কিন্তু হেডমাষ্টার সাহেব কিছু বোঝে না, ছুটির কথা বললে শুধু হাসে। আরও আছে। ফুটবল খেলায় "বজ্র" দলের কাছে আবুর দল তিনবার হেরে গেছে। তার দলের নাম 'বিজলী', এখন সবাই ঠাট্টা করে বিচলী বলে ডাকে। তার উপরে আবার ওর বাবা-মা বলেছে বুবুকে নাকি বিয়ে দেবে। বুবুর সঙ্গে তার খুব ভাব। বুবু চলে গেলে সে কার সঙ্গে খেলবে, কার বেণী ধরে টানবে, বাবা-মা রাগ করলে কার কাছে নালিশ করতে যাবে? আবু বারান্দায় বসে এ সব দুঃখের কথা ভাবছে, এমন সময় হোসেন তার কাছে এসে হাজির। হোসেন তার দলের সবচেয়ে ভাল খেলোয়াড়।

চল, একটা কালো শিশি যোগাড় করি। ফকির বাবা বলেছে শিশিটা কালো না হলে ভূতের বাচ্চা তার ভিতরে বাঁচতে পারবে না। ওষুধের দোকান থেকে তারা একটা কালো শিশি কিনে আনল, তারপর দু'জনে মিলে ফকির বাবার বাসায় গেল। সে অনেক দুরে। যেতে যেতে হোসেন আবুকে বুঝালো, একটু কষ্ট হলেও এই ফকির বাবার কাছে যাওয়াই ভাল। উনি ভূতের বাচ্চাও দেবেন, আবার এক বছরের গ্যারান্টিও দেবেন। ভাল না হলে পাল্টিয়ে দেবেন।

না। ছাত্ররা সবাই মিলে গতকাল খুব যত্নের সঙ্গে একটা দরখাস্ত লিখেছিল। এদিকে আবু ভূতের বাচ্ছাকে খুব অনুরোধ করেছিল। জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার জন্য সবাই লাইন করে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় হোসেন দরখাস্তের কাগজ হেডমাস্টারকে দিল। সবাই হেডমাস্টারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। হেডমাস্টার রেগে গেলেন। খাম শুদ্ধ দরখাস্তটা ছিড়ে ফেললেন। আবু সারাদিন ভূতের বাচ্চাকে বকতে লাগল... না, সারাদিন না। চারটার দিকে ঝড় এসে স্কুল ঘরের চাল উড়িয়ে নিয়ে গেল। টি,ও, সাহেব হেডমাস্টারকে বললেন, ঠিক আছে, পনের দিন আগে ছুটি দিন। আবু হাফ ছেড়ে বাঁচল।



মুশকিল হল, বুবু মামার বাড়ি যাবে না। বর তাকে দেখতে আসবে। বুবু বরকে চেনে। ওর বাবার জমিজমা থাকলে কি হবে, ছেলেটা বোকা, দেখতেও ভাল না। তাই বুবুর মন খারাপ। আবু বলল, কিছু ভেবো না, ভূতের বাচ্চাকে বলে আমি এই বিয়েটা ভেঙ্গে দিচ্ছি।

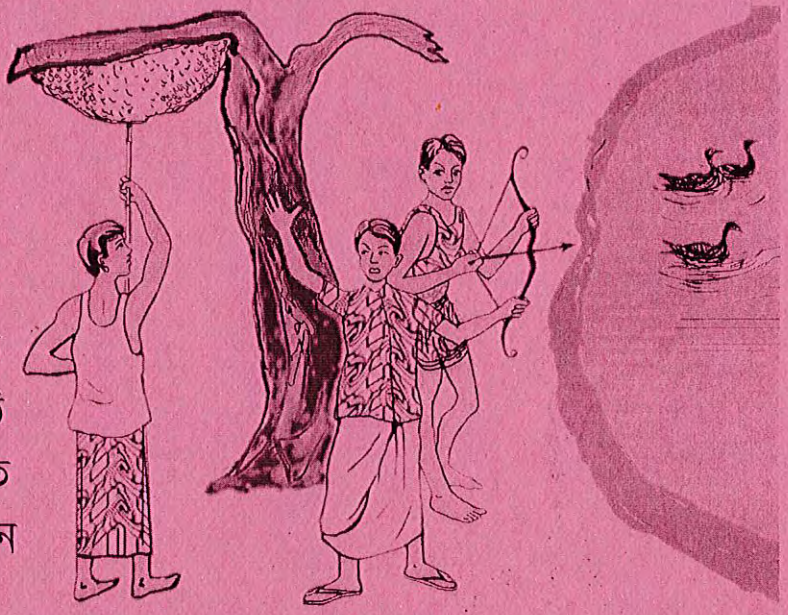
পরের দিন বরপক্ষ মেয়ে দেখতে এল। মেয়ে এমনিতে দেখতে সুন্দরী, কিন্তু যখন সে বানরের মত মুখ করে ব্যঙ্গাতে লাগল তখন তাকে এত বিশ্রী দেখাল যে বরপক্ষরা বলল, আর একদিন আসব। আর এল না।

মামার বাড়ি পনের দিন থেকে, দুই ভাইবোন ফিরে আসছিল।

পথে বুবু বলল, চল, ফকির বাবাকে এই কাঁঠালটা দিয়ে আসি। তিনি তো আমাদের অনেক উপকার করেছেন। তারা গিয়ে দেখে, একটা

৪০৯। বোকা চাঁন

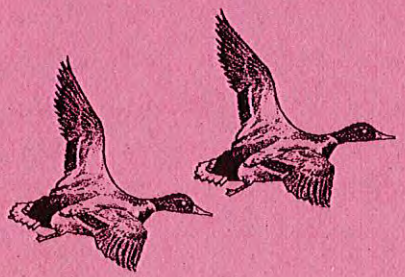
এক রাজার তিন ছেলে ছিল। বড় ছেলে খুব শক্তিশালী, মেজো ছেলে খুব চালাক, ছোট ছেলে এত সরল যে, সবাই তাকে বোকা চাঁন বলে ডাকত। তারা বড় হয়ে বাবাকে বলল, বাবা, আমরা জ্ঞান ও ভাগ্যের সন্ধানে দেশ-বিদেশ ঘুরে আসব। রাজা তাদের দোয়া করে বিদায় দিল। একদিন তিন ভাই এক বনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় এক পিপড়ার ঢিবি দেখতে পেল। বড় ভাই একটা লাঠি দিয়ে তা ভাঙ্গতে যাচ্ছিল। বোকা চাঁন বলল,



• না, ভাইয়া, ওরা তোমার কি ক্ষতি করেছে ?

• তোমার মন এত নরম ভাইয়া?... যাক, তুমি যখন বললে, আর ভাঙ্গলাম না।

আর একটু এগিয়ে তারা দেখল, এক বিলের মধ্যে কয়েকটা পাতি হাঁস তাদের বাচ্চাদের নিয়ে সাঁতরাচ্ছে। এবার মেজো ভাই বলল,



• আমি একটা হাঁস মেরে নিয়ে আসি, আমার খিদে পেয়েছে। বোকা চাঁন বলল,

• আমি তো পিঁপড়েদের রাজা, রাজাদের অনেক কিছু শিখতে হয়। তা... তুমি কাঁদছ কেন ?

• এক হাজার মুক্তা কোন মতেই খুঁজে আনতে পারব না।

• এক হাজার মুক্তা খুঁজে বের করা আমাদের কাছে একটা খেলার মত। এখানে একটু দেরী কর।

এ কথা বলে পিঁপড়েদের রাজা শিষ দিয়ে কি যেন বলতে লাগল। এক মুহূর্তের মধ্যে লক্ষ লক্ষ পিঁপড়া এসে হাজির। তারা কয়েক মিনিটের মধ্যে মুক্তা এনে তার ঝুড়ি ভরিয়ে দিল।

বোকা চাঁন প্রাসাদে মুক্তা এনে শুতে গেল। পরের দিন ভোরে প্রাসাদের দেওয়ালে আর একটা লিখন দেখতে পেলঃ- এই ঘুমন্ত প্রাসাদের যাদু কাটাতে হলে, রাজকুমারীদের ঘরের চাবি বিলের মধ্য থেকে খুঁজে আনতে হবে।

বোকা চাঁন ভাবল, এবার রক্ষা নেই। ভাইদের মত পাথর হয়ে যাব। তখন বিল থেকে একটা পাতি হাঁস এসে বলল, ভয় নেই, আমরা আছি। আমরা চাবিটা খুঁজে আনব। হাঁসটা কুয়াক কুয়াক করে কি যেন বলল। এক ঘন্টা ধরে হাজার হাজার হাঁস বিলটা তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজতে লাগল। শেষে চাবিটা তুলে নিয়ে আসল।



বোকা চাঁন পাঁচজন রাজকুমারীর ঘর

৪১০। বন্ধু কাকে বলে

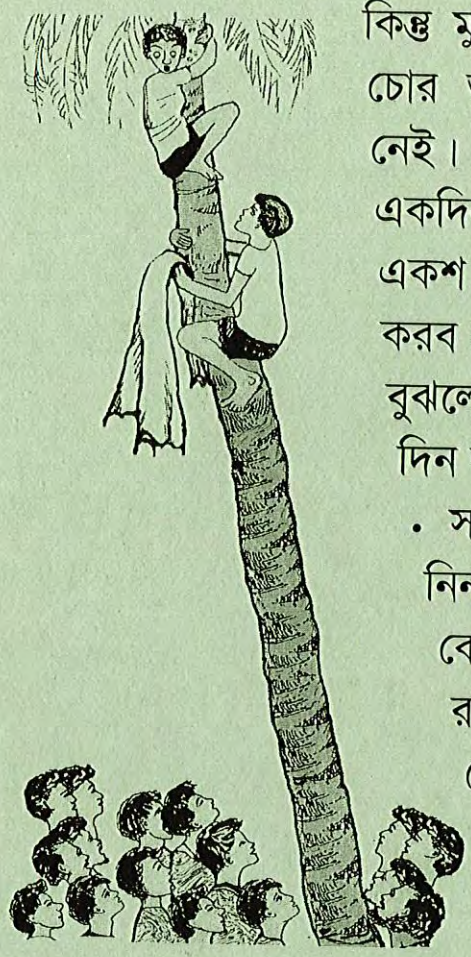
শংকর ক্লাস ফোরে পড়ে। সে কোনদিন মারামারি করে না, কারণ তার দরকার হয় না। তার বয়স ১০ বছর হলে কি হবে, তার ক্লাশের কোন ছেলে পারে না তার মত বল খেলতে, দৌঁড়াতে, গাছে চড়তে, নৌকা বাইতে। ক্লাশ ফাইভের ছাত্ররা তার কাছে হার মানে।



তার এক বন্ধু আছে, রফিক তার নাম। তাদের দু'জনের বাবা একসঙ্গে নদীতে মাছ ধরে। দু'জনের একটাই নৌকা। মাছ বেশী ধরা পড়লে দুজনেই আনন্দ করে, ধরা না পড়লে দুজনেই দুঃখ করে ও না খেয়ে থাকে।

রফিক শংকরের সঙ্গে এক ক্লাশে পড়ে। একসঙ্গে বাড়ীর কাজ করে, একসঙ্গে খেলে একসঙ্গে স্কুলে যায়। তাদের মধ্যে গলায় গলায় ভাব।

রফিক অঙ্কে সব সময় বেশী নম্বর পায়, কোনদিন তার ভুল হয় না। সেইজন্য ক্লাশের সমবায়ের টাকার হিসাব সে রাখে। সবাই সালামের হাতে টাকা জমা দেয়, তারপর রফিক তার সঙ্গে গিয়ে বট গাছের ফাকে টাকা রেখে খাতায় হিসাব লিখে রাখে। কিন্তু সেদিন সর্বনাশ হয়ে গেল। সালাম ও রফিক গিয়ে দেখল বটগাছের ফাকে কৌটা নেই, টাকাও নেই। শুধু খাতাটা পড়ে আছে। তাতে রফিকের লেখা মোট



কিন্তু মুখে না বললেও সবাই মনে মনে রফিক চোর ভাবতে লাগল। রফিকের দুঃখের অন্ত নেই। সে স্কুল কামাই করতে লাগল। তখন একদিন শংকর মাকে গিয়ে বলল, মা, আমাকে একশ টাকা দাও। আমি মাছ ধরে শোধ করব। মা ছেলেটার মুখের দিকে চেয়ে রইল। বুঝলো ঐটুকু ছেলে মানুষ হয়েছে। পরের দিন শংকর ক্লাশের মধ্যে হাত তুলে বলল,

• স্যার আমি সমবায়ের টাকা নিয়েছি, এই নিন ১০১ টাকা।

কেউ কোন কথা বলল না। তবে সেদিন রফিকের বদনাম ও নির্যাতন শেষ হয়ে গেল। সকলে তার সঙ্গে আবার কথা বলতে ও খেলা করতে লাগল। এদিকে শংকর টিফিনের সময় স্কুলের মাঠের বাইরে গিয়ে একা একা ডাংগুলি খেলে। এইভাবে তিন মাস কেটে গেল।

একদিন মালেক নামে ক্লাশ ফোরের এক ছাত্র বাজি ধরল নারিকেল গাছে উঠে একটা ডাব পাড়বে। সে কোনদিন এত উঁচু গাছে ওঠেনি। উঠে যেই নীচের দিকে তাকাল, সে ভয় পেয়ে গেল। মাথা ঘুরছে, মাথা ঘুরছে, এই বলে সে গাছটা আকড়ে ধরে থাকল। আর নেমে আসার শক্তি পাচ্ছে না। মাঠের তিনশো ছেলেমেয়ে তার দিকে চেয়ে নিস্তব্ধ হয়ে আছে। তখন রফিক দৌড়ে গিয়ে শংকরকে ডেকে নিয়ে আসল। বলল, শীঘ্রি আয়, মালেক পড়ে যাবে। শংকর স্যারের কাছে গিয়ে বলল, স্যার আপনার চাদর! চাদরটা গলায় জড়িয়ে চোখের পলকে

৪১১। ছাইমাখা ১

আলোমতির বয়স আঠার বছর। তার হাসিতে যেন মুক্তা ঝরে, যত ঝরে তত বাড়ে। গ্রামের লোকেরা তার হাসিমুখ দেখার জন্য বাড়িতে আসে, দেখে তারাও হাসিমুখে ফিরে যায়। কিন্তু আলোমতির মা নেই, বাবাও বিদেশে। তার সৎ মা নিজের দু'টি মেয়েকে ভালবাসে, কিন্তু আলোমতি সবচেয়ে সুন্দরী বলে, তাকে হিংসা করে ও সংসারের সব কাজ আলোমতির উপর চাপিয়ে দেয়। তাকে কোন ভাল কাপড় পরতে দেয় না। কাজ করতে করতে তার গায়ে এত ধুলো ও ছাই পড়ে যে তাকে সবাই ছাইমাখা বলে ডাকতে শুরু করেছে। তবু তার হাসি ফুরায় না।





হঠাৎ সৎ মা ঘর থেকে বের হয়,

• শুধু গল্প গল্প আর গল্প... তোমার কাজ শেষ হবে কবে শুনি? তোমার মত বড় মেয়ের এত খেলা করা সাজে না, বুঝলে?

• এই তো মা, উঠান ঝাড় দেওয়া হয়ে গেছে, আর আছে কী?

• কেন? বারান্দা লেপতে হবে না? রান্না করতে হবে না? জানো তো তোমার দুই বোনের স্বাস্থ্য ভাল না, ডাক্তার ওদের বিশ্রাম করতে বলেছে... দেখে এস তো, ওদের খাবার তৈরী আছে কি না?...

নখে পালিশ ও ঠোটে লিপস্টিক দিতে দিতে মা চলে গেল। এদিকে আলোমতির বান্ধবী ফুলি এসে গেল।

• ছাইমাখা! ও ছাইমাখা! আমার কাপড় কেঁচে দাও তো!... কি ব্যপার, তোমার কান নেই?

• ছাইমাখা আবার কে? আমার নাম আলোমতি। তোমরা কেন আমাকে ছাইমাখা বলে ডাক?

• বাঃ তুমি সারাদিন ধুলো ছাই মেখে থাক, তাই ছাইমাখা বলে ডাকি।

• আমার ভাল লাগে না!

• আমাদের কিন্তু ভাল লাগে। তুমি করবে কি?

• আমি? আমি কিছু করব না... এই নাও, তোমাদের বয়স হয়েছে, তোমাদের কাপড় কাঁচার জন্য আমি ধুলো ছাই মাখতে পারব না।

• মা! মাগো! শুনলে? ছাইমাখা আমাদের কাপড় কাঁচবে না।





• কেন? কাঁচবে না কেন? তার কি হয়েছে?

• মা, আমি তাদের দাসী নই, আমার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করুক, তখন দেখা যাবে!

• কাপড় কাচবে না তো কি করবে তুমি, শুনি? অলস হয়ে বসে থাকবে?

• আমি অলস, এই কথা মিথ্যা। তোমরা তিনজনে যত কাজ কর, তার চেয়ে বেশী কাজ আমি একাই করি, তোমরা তো জান!

• শুনলে! শুনলে বেয়াদব মেয়ের কথা! আমি কিন্তু তোমার থোতা মুখ ভোতা করে দেব! দাড়াও, দেখাচ্ছি মজা!

৪১২। ছাইমাখা ২



ফুলি আলোমতিকে দাওয়াত করতে এসেছে।

• আলো, আগামী সপ্তা আমার বিয়ে। তোমাকে নিমন্ত্রন করতে এলাম। আমার বিয়ের দিন আর কেউ না আসুক তোমাকে আসতে হবে।

• ফুলি... এই কাপড় ছাড়া আমার আর কোন কাপড় নেই...

• কেউ তোমার কাপড় দেখবে না বুবু, দেখবে তোমার মুখ ও তোমার হাসি। তোমার মত হাসি সারা গ্রামে আর নেই...

রাত হয়ে গেছে। আলোমতির দুই বোন তাদের ঝল্‌মলে শাড়ি পরে মায়ের সঙ্গে রাজবাড়িতে গেছে। ছাইমাখার কোন ভাল কাপড় নেই, তাই যেতে পারে নি। রাজপ্রাসাদ আলোতে ভরে গেছে। আলোমতি কেঁদে কেঁদে বিছানা ভাসিয়ে দেয়। শেষে আর থাকতে পারল না। তার ছেড়া কাপড় পরে রাজপ্রাসাদের দিকে চলল। প্রাসাদের পাশে এসে, জানালা দিয়ে উঁকি মারল। আলোমতির চোখ আটকে গেল রাজপুত্রের উপর। হঠাৎ সে আর কিছু দেখতে পেল না। আর কিছু শুনতে পেল না... রাজপুত্র কিন্তু তার আসন ছেড়ে দিয়ে সেই



দেখুন, ঠিক খেটে যাবে!

• খেটে গেলে কি হবে? আমি যে মেয়েটাকে খুঁজি, তার নাক বাঁকা নয়। তোমাদের বাড়িতে আর কোন মেয়ে নেই ?



তখন ছাইমাখা জানালা দিয়ে উঁকি মারল।

• ঐ যে, ঐ মেয়েটিকে ডেকে আন।

ছাইমাখা বের হল তার ছেড়া কাপড় পরে ।

• এস মা, দেখ তো এই চপ্পলটা কার? তোমার পায়ে খাটে কি না পরে দেখ তো?... বাহ্! ঠিক খেটে গেছে! আর এক চপ্পলটা কই?

• এই যে, মন্ত্রী সাহেব।

• মা, যুবরাজ তোমাকে বিয়ে করতে চায়। তুমি যদি রাজি হও তবে এই কাপড় পড়। সে নিজে এসে তোমাকে নিয়ে যাবে।

• মন্ত্রী সাহেব, চপ্পলটা আমার, তাই ফিরিয়ে নিলাম, কিন্তু এই কাপড় আমার নয়, যুবরাজকে ফিরিয়ে দিন। যুবরাজ যদি আমাকে চান, তবে আমি যে ভাবে আছি সেই ভাবেই আমাকে নিতে হবে।

• মানে...বেশ... উজির সাহেব, এক্ষনই রাজপুত্রকে খবর দিয়ে এস।

রাজপুত্র সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ হয়ে উঠল। ঘোড়ায় চড়ে ছুটে এল।

৪১৩। চম্পার যাদু

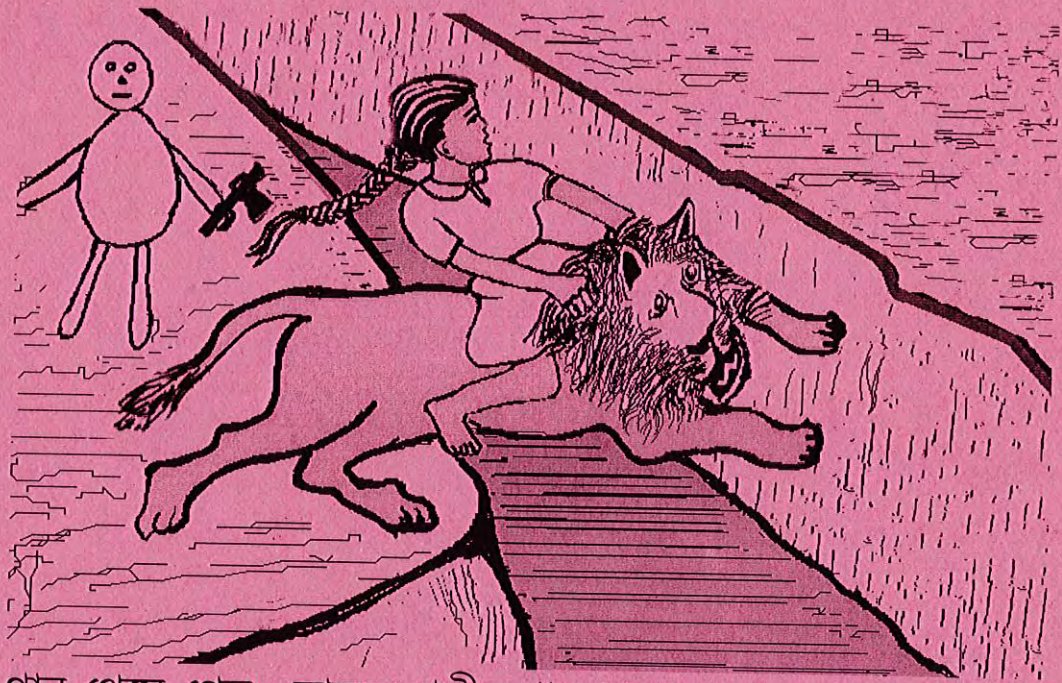


বাগানের এক কোণে চম্পার জন্য বাবা তক্তা দিয়ে ছোট একটা খেলাঘর তৈরী করেছে। আজ চম্পা সেখানে খেলছে। তার সঙ্গে খেলছে লালু, কাপড়ের তৈরী একটা সিংহ, আর লুলু, তার পুতুল, সেটাও কাপড়ের তৈরী। সিংহটা খুব বড়। পুতুলটাও বেশ বড়, প্রায় চম্পার সমান। চম্পা নিজেই সেটা তৈরী করেছে খড় ও পুরানো কাপড় দিয়ে। তারা খেলছিল, এমন সময় হঠাৎ আকাশ কালো মেঘে অন্ধকার হয়ে গেল। মা এসে তার হাত ধরে বাড়ির দিকে টেনে নিয়ে গেল। বলল, তুফান আসছে। এ কথা শুনে চম্পা তার হাত ছাড়িয়ে বলল, তাহলে লালু আর লুলুকে বাড়ি আনতে হবে। চম্পা দৌড়ে খেলাঘরে ফিরে গেল। লালু আর লুলুকে ধরে চলে আসছিল এমন সময় তুফান এসে গেল। খেলাঘর ঘুরপাক খেয়ে বেলুনের মত আকাশে উড়তে লাগল। অনেকক্ষণ উড়ে যাওয়ার পরে এক সময় ঘরটা স্থির হয়ে গেল। চম্পা দরজা খুলে বের হল, লালু বের হল, লুলু বের হল। তাদের সামনে এক অদ্ভুত সুন্দর দেশ। একটা লাল রাস্তা চলে গেছে পশ্চিমের দিকে। চম্পা লোকদের জিজ্ঞাসা করল, নিশ্চিন্তপুর যাব কোন পথে ?

- নিশ্চিন্তপুর আমরা চিনি না।
- তাহলে আমি এখন কি করি... ? এই বলে চম্পা কেঁদে ফেলল।

করে দাও। যাদুকর চম্পার মুখের দিকে চেয়ে তার কানে কানে চুপে চুপে কি যেন বলল।

• পরের দিন ভোরে তিনজনেই পথ ধরল। লালু জিজ্ঞাসা করল, যাদুকর কি আমাকে সাহস দিয়েছে ? লুলু জিজ্ঞাসা করল, যাদুকর কি আমার মাথায় ঘিলু দিয়েছে ? চম্পা বলল, হেঁটে চল, দেখতে পাবে। তারা তিনজনে গান গাইতে গাইতে হাঁটতে লাগল। কিন্তু হঠাৎ তাদের



গান থেমে গেল। সামনে গভীর খাদ। কারও পার হওয়ার সাধ্য নেই। লালু ও লুলু চম্পার দিকে তাকাল। তখন চম্পা হাসল। হঠাৎ সিংহ পিছনের দিকে কিছুদুর গিয়ে আবার দৌড়ে এসে এক লাফে ওপারে চলে গেল। তারপর এক লাফে আবার ফিরে এল। চম্পা জিজ্ঞাসা করল, তোমার ভয় করেনি ? সিংহ বলল, করেছে। তবে ভয়ের কথা আমি ভাবিনি। আমার পিঠে একজন করে চড়ে বস। আমার কেশর শক্ত করে ধর। সিংহ একজন করে তাদের দুজনকে পার করিয়ে দিল। তারা আবার গান গাইতে গাইতে হাঁটতে লাগল।

৪১৪। দাদা চলে যাচ্ছে

১৯৭৪ সাল। আমার বয়স তখন ১০ বছর। সবাই বলত, রফিকের মত সুখী ছেলে সারা গ্রামে আর নেই। আমি নাকি দাদার মত ফূর্তিবাজ। তার সঙ্গে ঘেষতে ঘেষতে দাদার হাসি আমার মুখে লেগেছিল।

দাদা বড় নদী ভালবাসত, নদীটা এত চওড়া যে, পার হবার আগে সব মাঝিরা আল্লার নাম করত, তার জোয়ার ভাটা এত দ্রুত যে, কেউ উল্টো দিকে যেতে সাহস করত না। জোয়ারে ভেসে যেত আর ভাটায় ফিরে আসত।

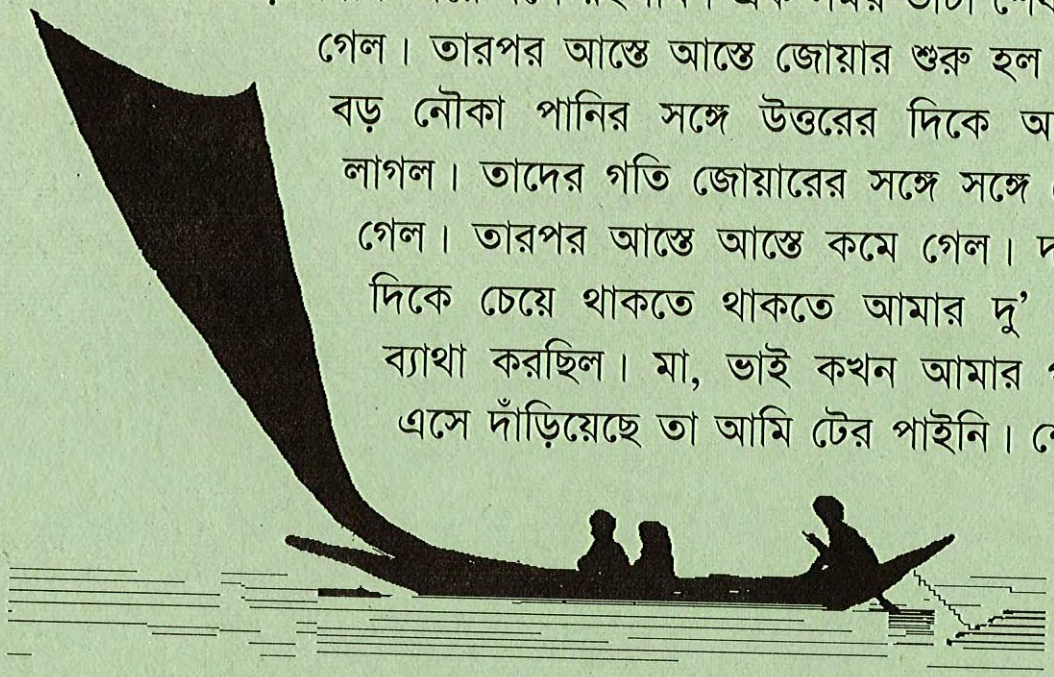
সেদিন বাবার নৌকায় চড়ে আমাদের দুই ভাইকে নিয়ে দাদা ও দাদী মেলায় গিয়েছিল। যেতে যেতে দাদা নদীর স্বভাব আমাদের বুঝাতে লাগল। জোয়ার ভাটা কি আশ্চর্য জিনিষ দেখছ ? এই সময় মেলায় গেলে নদী আমাদের নিয়ে যাবে তারপর ফিরিয়ে আনবে, একেবারে



এমনি, বইঠার এক টান দেওয়াই লাগবে না। আমাদের মত ভাগ্যবান আর কে আছ বল ?

সত্যি, আমাদের মত ভাগ্যবান আর কে হতে পারত ? দাদা-দাদীর সঙ্গে সেদিন মেলায় যাব, এমন কথা ভাবতেই পারিনি। বাড়িতে বড় অভাব। সবাই এক বেলা খেতাম। মা খুব মেপে মেপে থালায় ভাত

লাগেনি। বড় নদীর তীরে বসে রইলাম। এক সময় ভাটা শেষ হয়ে গেল। তারপর আস্তে আস্তে জোয়ার শুরু হল। বড় বড় নৌকা পানির সঙ্গে উত্তরের দিকে আসতে লাগল। তাদের গতি জোয়ারের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে গেল। তারপর আস্তে আস্তে কমে গেল। দক্ষিণ দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আমার দু' চোখ ব্যাথা করছিল। মা, ভাই কখন আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তা আমি টের পাইনি। শেষে,



অনেক দূরে, বড় বড় নৌকার মাঝখানে একটা বিন্দু দেখতে পেলাম। তখন উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, ঐ যে! ওরা আসছে!

দাদা নৌকা থেকে নেমে আমার দিকে এল। আমি তার গলা জড়িয়ে ধরে ঝর ঝর করে কাঁদতে লাগলাম...

৪১৫। দাউদ ও গলিয়াৎ

তিন হাজার বছর আগের কথা। এক সময় হিব্রু ও ইমোরীয় জাতির মধ্যে এক মারাত্বক যুদ্ধ লেগে গেল। জর্দান নদীর পাশে একটা দেশ আছে, হিব্রুদের দেশ। তারা কিন্তু দূর্ভিক্ষের তাগিদে এক দিন মিশরে চলে গিয়েছিল, ফিরে এল দু'শো বছর পরে। এসে বলল, এটা আমাদের পূর্ব পুরুষদের দেশ, ফিরিয়ে দাও। ইমোরীয়রা বলল, আমরা এখানে জন্মেছি, বাপ-দাদার আমল থেকে এটা আমাদের বাড়ি ও আমাদের দেশ। আমরা ছাড়ব কেন?

হিব্রুদের সেনাদল একটা পাহাড়ের গায়ে এমন জায়গায় শিবির গেড়ে বসেছিল যে তাদের আক্রমণ করা প্রায় অসম্ভব ছিল। কিন্তু শত্রু সেনাদল ছিল তাদের চেয়ে বড় ও শক্তিশালী। তাদের মধ্যে অনেকে পেশাদারী যোদ্ধা, ছোটবেলা থেকে তারা যুদ্ধ করে আসছে।

একদিন দাউদ নামে এক যুবক হিব্রুদের শিবির দেখতে এল। তার দুই বড় ভাই সেনাদলে যোগ দিয়েছিল। সে তাদের জন্য কিছু খাবার এনেছিল। দুই ভাই খেয়ে দেয়ে বলল, বেশ, এবার শীঘ্রি বাড়ি ফিরে যাও, যুদ্ধ আমাদের কাজ, তোমার নয়। আমাদের মেষ চরাবে কে?

দাউদ তাদের ভাব-সাব দেখে বুঝতে পারল যুদ্ধের গতি ভাল নয়। তাদের মনে ভয়। বাড়ি যাবার আগে পাহাড়ের উপর থেকে শত্রু দলের দিকে চেয়ে দেখল। ঠিক সেই সময় শত্রু শিবির থেকে বের হল এক মহাবীর, তার উচ্চতা সাত ফুটের কম নয়, তার ঢাল ও তলোয়ার বিরাট, তার কণ্ঠস্বর বজ্রের মত। সে বলতে লাগল, শিয়াল খরগোসের জাত, তোমাদের একজন আমার সঙ্গে লড়াই করতে আসুক। যার জয় হবে সে এই ভূমিটা পাবে, আর যুদ্ধ করা লাগবে না।

ছেলে মায়ের কোলে ফিরে যা। দাউদ বলল, তুমি নিজের দাম বাড়াবার জন্য লড়তে এলে। আমি নিজের ভাইবোনদের বাঁচাবার জন্য লড়ব। আমার সঙ্গে তুমি পারবে না। তোমার শেষ দিন এসেছে।
গলিয়াৎ তলোয়ার বের করতে গেল। কিন্তু সময় পেল না। বিদ্যুৎ বেগে একটা পাথর দাউদের ফিঙ্গা থেকে এসে তার কপালে ঢুকে পড়ল।





গলিয়াৎ চিৎ হয়ে পড়ে গেল। আর উঠল না।
ইমোরীয়দের সেনাদল তার মহাবীরের দশা দেখে ভয়ে পালাতে শুরু করল। হিব্রুরা তাদের ধাওয়া করে সেনাদলটা বিনাশ করে ফেলল।

৪১৭। জ্ঞানের বস্তা ১

অনেক অনেক দিন আগের কথা। একটা গ্রাম ছিল। গ্রামটা শহর থেকে অনেক দূরে,পাহাড়-পর্বতের মাঝে। একদিন মোড়ল তার পনের বছরের ছেলের উপর খুব রাগ করল।

• পাঁচ কেজি চালের দাম হল একশ টাকা। তুমি দেড়শ টাকা দিলে কোন হিসাবে? তোমার লজ্জা করে না?



• দোকানদার বলল, দাম বেড়ে গেছে। দোকানে আমার মত একটা ছেলে ছিল, সেও বলল, চালের দাম বেড়ে গেছে, জান না?...

• আমাদের মত বোকা মানুষ জগতে আর নেই। শোন বাবা, একটা মিটিং ডাকতে হবে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে বল, সন্ধ্যার পরে তারা যেন এসে চা খেয়ে যায়। ব্যপারটা খুব জরুরী, সবাই যেন উপস্থিত হয়।

রাত্রে সবাই এল। মোড়লের মুখ কালো, গম্ভীর।



• ভাই সব, আমরা দিন দিন মানুষের কাছে বোকা বনে

• আচ্ছা ভাই, জ্ঞান পাব কোথায়, বলতে পারেন?

• না ভাই, বলতে পারি না।

• ভাই, জ্ঞানের দোকান কোথায়, বলতে পারেন?



• জ্ঞান না ফ্যান? ঐ মোড়ে দেখুন, তিন চারটে ফ্যানের দোকান আছে।

• ভাই, আপনি কি জ্ঞান বিক্রী করেন?

• না ভাই, সামনে খোঁজ করেন।

• না! আর কোন আশা নেই। চল, বাড়ি ফিরে যাই, কি বল?

• না নুরু ভাই, আর একটু চেষ্টা করি... চল, ঐ দোকানে যাই। দেখ ওখানে কত রকমের বস্তা...। দোকানদার ভাই, আপনি কি জ্ঞান বিক্রী করেন?

• মানে... আচ্ছা ভাই, তোমরা কোন দেশের লোক?

• আমরা পাহাড়ে বাস করি। আমাদের গ্রামের নাম মনিপুর।

• কি বললে? মনিপর! মনিপুরে তো আমার মামার বাড়ি! বিশ বছর সেখানে যাইনি। বস, চা খাও, তারপর তোমাদের সমস্যাটা খুলে বল।

• যাক, বাঁচা গেল! ভাই, আমাদের সমস্যা গুরুতর, আমাদের জ্ঞান নেই, তাই চাঁদা তুলে সারা গ্রামের জন্য জ্ঞান কিনতে এসেছি, কেন, তোমরা জ্ঞান বেচবে না?

• মানে... জ্ঞান জিনিষটার যা দাম... তাই আমি দোকানে রাখি না, খুচরাও বেচি না। তোমরা এক ঘন্টা পর এস। আমি তিন বস্তা জ্ঞান এনে দেব, আর কি ভাবে তা খেতে হয়, তাও কাগজে লিখে দেব।

৪১৮। জ্ঞানের বস্তা ২



মনিপুরের তিনজন ব্যাবসায়ী জ্ঞানের বস্তা নিয়ে ফিরে এল। বলল,

. ভাই সব, আমাদের খুব কষ্ট করতে হল তবে কাজ সেরে এলাম। জাপানে তৈরী এক নম্বর জ্ঞান নিয়ে এসেছি, দেখে যাও!... তবে হ্যাঁ, এই মাল যা-তা জিনিষ নয় যে নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করা যায়। এটা ওষুধের মত, ডাক্তারের কাগজ পড়ে খেতে হয়। দেখ, এই তিনটি কাগজে খাওয়ার পদ্ধতি লেখা আছে। কই, মাস্টার সাহেব, আছেন? সবাইকে পড়ে শুনাতে হবে। সবাই চুপ করে মন দিয়ে শোন ।

মাস্টার সাহেব পড়তে লাগলঃ-

১। এই জ্ঞানের বস্তা হল এক নম্বর, পরিস্কার ও সুক্ষ মাল। আমরা গ্রান্টি দিচ্ছি রীতিমত এক বছর এটা খেলে যেকোন বোকা বুদ্ধিমান হয়। ২। খাবার নিয়ম ঃ- প্রত্যেকদিন সকাল বেলা তিন পৃষ্ঠা বই পড়ার পর, আর সন্ধ্যাবেলা তিন পৃষ্ঠা বই লেখার পর, এক চিমটি জ্ঞান

চৌদ্দ বছরের দুটি ভাইবোন বাজারে গিয়ে বিপদে পড়েছিল। দোকানদার তাড়া-হুড়া করে তাদের বুঝাতে লাগল,

• এই নাও বাপধনেরা, ছয় কেজি চালের দাম হল গিয়ে... বিশ টাকা করে... ছয় বিশ একশ সাট টাকা, টাকা দাও। আবার আসবে কিন্তু।

• বুবু, আঙ্গুল দিয়ে গুনতে হবে না, ও আমাদের ঠকাচ্ছে।

• খোকাবাবু কি বলছে, দিদিমনি?

• কালু মিয়া, এই চালের দাম বিশ টাকা নয়, পনের টাকা কেজি, তাই খোকাবাবু রাগ করছে। আরও রাগ করছে এই জন্য যে তার মাথায় ছয় বিশ একশ সাত টাকা হয় না, একশ-বিশ হয়। আপনার চাল আপনি রাখুন, আপনার চাল আমরা কিনব না!

• সে কি!... ও, তাই তো! আমি লক্ষ্য করিনি এটা অন্য চাল... খোকাবাবু ঠিক বলেছে, ছয় পনের... একশ বিশ টাকা হয়। তোমরা একশ বিশ টাকা দিয়ে চাল নিয়ে যাও। আর ভুল হবে না খোকাবাবু।



• কালু মিয়া, আপনি যত ইচ্ছা ভুল করতে পারেন, আমাদের লাভ-লোকসান কিছু হবে না। আজ থেকে মনিপুর গ্রামের কেউ আপনার

৪১৯। ঘুমন্ত দ্বীপের পানি

এক ধনী লোক ছিল, তার তিনটি ছেলে। এক রাত্রে বাবা একটা স্বপ্ন দেখল। স্বপ্নটি ভয়াবহ। সকালে চোখ খুলে কিছু দেখতে পেল না। সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তাররা তাকে সুস্থ করার জন্য কোন উপায় খুঁজে পেল না। শেষে এক ফকির এসে বলল, এই রোগের একটা মাত্র ওষুধ আছে, ঘুমন্ত দ্বীপের পানি। তিনজন ছেলেই বাবাকে ভালবাসত। বড়জন বলল, আমি পানি নিয়ে আসব। এই বলে বন্দরে চলে গেল। এক জাহাজে উঠে ঘুমন্ত দ্বীপের উদ্দেশ্যে রওনা হল। পথে জাহাজ এক ঘন্টার জন্য আনন্দ দ্বীপের ঘাটে থামল। ছেলেটা জাহাজ থেকে নেমে একটা সুন্দর বাগান দেখতে পেল। ভিতরে প্রবেশ করল। খুব সুন্দরী এক মেয়ে তাকে অভ্যর্থনা করে বলল, তোমার মত জোয়ান, সুন্দর, বুদ্ধিমান ছেলে এখানে কোন দিন আসেনি, দয়া করে থেকে যাও।

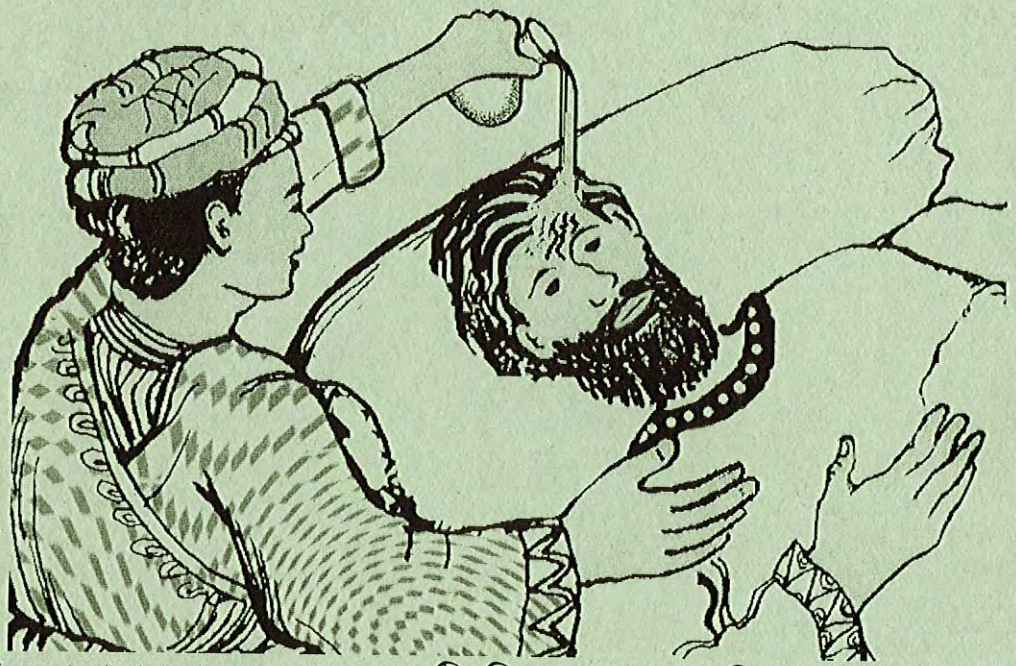


ছেলেটি তার মায়ায় পড়ে গেল। বাবার কথা ভুলে মেয়েটাকে বিয়ে করে সেখানেই থেকে গেল।

মেজো ছেলে বলল, হয়তো ভাই কোন বিপদে পড়েছে, আমি খুঁজতে যাই।

সেই পানি। স্রোতে ভাসতে ভাসতে এক বিরাট প্রাসাদের মধ্যে পৌছে গেল। এখানে সবাই ঘুমাচ্ছিল। এক সোনার পালঙ্কে ঘুমাচ্ছিল একটা মেয়ে। তার মত সুন্দরী মেয়ে সে জীবনেও দেখেনি। ছেলেটা তার কপালে হাত বুলালো। মেয়েটি ঘুমিয়েই রইল। ছেলেটা ভাবল, আমার ফিরে যেতে হবে পানি নিয়ে। খালে গিয়ে এক ঘটি পানি নিয়ে চলে গেল... কিন্তু যাবার আগে নিজের হাতের আংটি খুলে মেয়েটির হাতে পরিয়ে দিল। তাকে ছেড়ে যেতে মন চাচ্ছিল না... শেষে চোখের পানি মুছতে মুছতে বন্দরে ফিরে গেল।

বাড়ি ফিরে এসে সঙ্গে সঙ্গে সেই পানি দিয়ে বাবার চোখ ধুঁয়ে



দিল। বাবা আবার চোখের দৃষ্টি ফিরে পেল। বাড়ির সবাই ঘরের ছাদে গিয়ে আনন্দে উল্লাসে মেতে উঠল। এমন সময় সমুদ্রের মধ্য দিয়ে এক সোনালী জাহাজ এসে বন্দরে ভিড়ল। জাহাজ থেকে নেমে এল এক আশ্চর্য সুন্দরী মেয়ে। ঘুমন্ত দ্বীপের রাজকন্যা। তার সঙ্গে রাজার পরিষদবর্গ, মন্ত্রী ও সেনাপতি। তারা ছেলেটার কাছে এসে বলল,

৪২০। জাদুর আংটি

এক চাষী মরে যাচ্ছিল। তার তিনটি ছেলে ছিল। মরার সময় তাদের ডেকে বলল, আমার আছে একটা বাড়ি, একটা জমি আর কিছু জমানো টাকা। আর আছে একটা আংটি। সেটা আঙ্গুলে পরলে পশুদের ভাষা বুঝা যায়। তোমরা কে কোনটা নেবে বেছে নাও। বড়জন বলল, আমি ঘর ও জমি নেব। মেজজন বলল, আমি টাকা নেব। ছোটজনের ভাগ্যে শুধু আংটিটা রয়ে গেল। ছেলেটার নাম বকু।



বাবা মরে গেলে বকু একদিন বড় ভাইয়ের বাড়িতে ছিল। তারপর বড় ভাই তাকে চলে যেতে বলল। তখন সে মেজ ভাইয়ের কাছে গেল। কিন্তু পরের দিন মেজ ভাইও তাকে যেতে বলল। তখন বকু পথে বের হল। এখানে-ওখানে ঘুরে, পেটে-ভাতে কাজ করতে লাগল।

একদিন সে কোন কাজ পেল না, রাত হলে গাছের তলে শুয়ে পড়ল। ক্ষুধার জ্বালায় তার ঘুম আসছিল না। তখন শুনতে পেল বিড়ালী গড় গড় করে বিড়ালকে বলছে, মানুষ জাতি অনেক কিছু জানে তবে ওষুধ তৈরী করার বেলায় তারা বোকার হদ্দ। এই দেখ, রাজার কাছে তিন তিনটি ডাক্তার, কেউ ওর ছেলেকে সুস্থ করতে পারছে না, অথচ এই



তখন বকু রাজাকে বলল, মহারাজ, আপনার প্রধান মন্ত্রী ও সেনাপতিকে বন্দী না করলে এই রাতে আপনার রাজত্ব শেষ হয়ে যাবে। রাজা সঙ্গে সঙ্গে দু'জন গুপ্তচর পাঠিয়ে ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারল। তখন সেনাপতি ও প্রধান মন্ত্রীকে বন্দী করে দিল।

ইতিমধ্যে রাজপুত্র ঘুম থেকে উঠে খেলতে শুরু করেছে। বকুর সঙ্গে তার খুব ভাব। বাবাকে বলল, বকু আমাদের সঙ্গে থাকবে।

রাজা বলল, বকু, আমি তোমাকে প্রধান মন্ত্রী করে দিলাম। বকু বলল, না মহারাজ, মন্ত্রী হতে সকলেই পারে, কিন্তু আমি যা করতে পারি তা

৪২১। যাদুর বাঁশি

এক রাজা ছিল। তার মত সৎ ও মহৎ রাজা কেউ দেখেনি। তার প্রাসাদের ফটকে লেখা ছিল, টাকার চেয়ে মানুষের দাম বেশী। তার প্রজাদের ঘরে ঘরে লেখা ছিল, আমরা আমাদের কথা রাখি। তবুও সে রাজ্যে সুখ ছিল না। প্রত্যেকের বাড়িতে, জমিতে, অসংখ্য ইঁদুর বাসা বেধে থাকত ও সারা বছর ফসল খেয়ে ফেলত। গ্রামবাসীদের না খেয়ে থাকতে হত। কোন রকমের ওষুধ, ফাঁদ, যাদু বা মন্ত্র দিয়ে কেউ তাদের ধ্বংস করতে পারেনি।

একদিন সন্ধ্যায় এক চাষীর বাড়িতে আশ্রয় নিতে এল এক পথিক। চাষী বলল, মেহমানদের সেবা করা আমাদের ধর্ম। তবে আজ রাত্রে আপনাকে একটা রুটি ও এক গ্লাস পানি ছাড়া কিছু দিতে পারব না। এই বলে চাষীটি তাকে ইঁদুরের উৎপাতের কথা শুনাতে লাগল।

পথিক ছিল এক যাদুকর। সে বলল, কাল সকালে আমাকে রাজার কাছে নিয়ে যাও। আমি তোমাদের একটা উপায় করে দেব।

যাদুকর রাজাকে জিজ্ঞাসা করল,

- ইঁদুর কি সত্যি আপনাদের খুব বেশী ক্ষতি করে?
- করে। দশ বস্তা ধান হলে ওরা পাঁচ বস্তা খেয়ে ফেলে।
- আমি যদি তাদের ধ্বংস করি, তবে আপনারা সবাই এই বছরে ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ আমাকে দিতে রাজি?

রাজা ও চাষীরা সবাই রাজি হল। যাদুকর বলল,

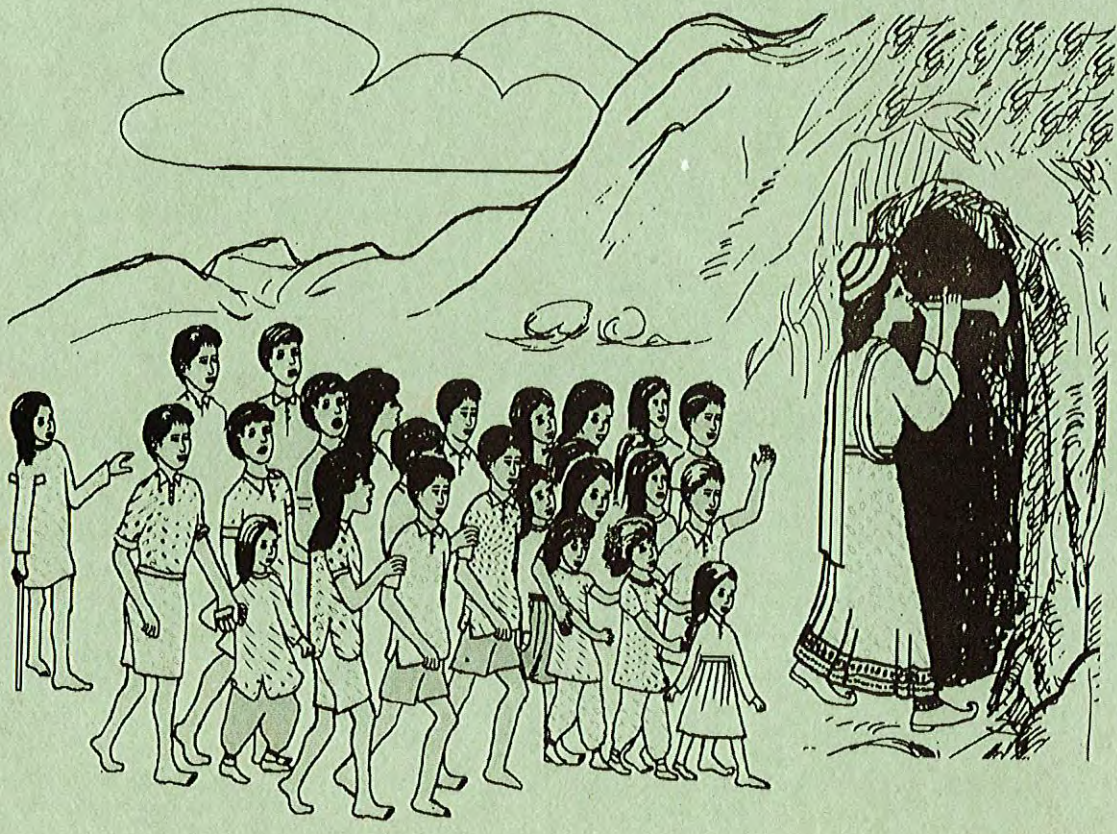
- ভেবে চিন্তে কথা বলুন। কথা না রাখলে আপনাদের সর্বনাশ হবে।
- আমাদের কথার নড়চড় হয় না। দেখুন আমাদের দরজায় কি লেখা আছেঃ- আমরা আমাদের কথা রাখি। এ দিকে রাজার ফটকে লেখা আছে, টাকার চেয়ে মানুষের দাম বেশী।

যাদুকর রাজার কাছে গেল। রাজপ্রাসাদের ফটকেও লিখনটা পাল্টে গিয়েছিল। এবার লেখা ছিল, মানুষের চেয়ে টাকার দাম বেশী। রাজা বলল, তোমার কাছে আমাদের কোন ঋণ আছে বলে তো আমার মনে পড়ে না। চুক্তির দলিল কই?

যাদুকর গ্রামবাসীদের কাছে ফিরে এল। তারাও বলল,

তোমার কাছে আমাদের কোন ঋণ আছে বলে তো আমাদের মনে পড়ে না। চুক্তির দলিল দেখাও।

গ্রামবাসীদের অপমানজনক ব্যবহার দেখে যাদুকর কেঁদে ফেলল। অনেকক্ষণ কাঁদতে লাগল। তারপর বাঁশীটা বের করল। বাঁশী বাজাতে

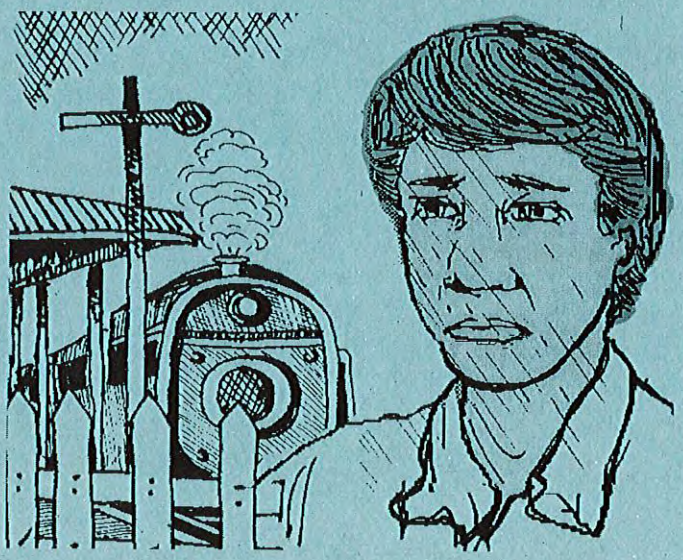


৪২২। যারা মরতে যায়



• এরা সবাই পাশ করতে পেরেছে, আমি পারলাম না কেন ? আমার কোন দাম নেই। আমার কপালে সুখ নেই। বাবা কি বলবে ? মীনার সঙ্গে আমার বিয়ে হবার কথা, আর হবে না। বাড়ি গিয়ে মুখ দেখাই কি করে? আই. এ. পাশ না করলে কোন চাকরি মেলে না।

সেলিম দেখছিল কলেজের বারান্দায় তার সহপাঠীদের মুখে হাসি। যারা পাশ করেছে তারা ওখানে থেকে থেকে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে হাসাহাসি করছে। যারা ফেল করেছে তারা অপরাধীর মত পালিয়ে যাচ্ছে। তাদের মুখে লজ্জা, অভিমান, দঃখ, রাগ... কেউ সেখানে দাঁড়াচ্ছে না, তারা পরাজিত, তারা মুখ দেখাতে চায় না। সেলিম লজ্জায় মরতে চায়। সেলিম পালিয়ে যায়। রেল স্টেশনের দিকে যায়।



জিজ্ঞাসা করলে সে উত্তর দিত, আমি মরতে যাচ্ছি, আমি ফেল করেছি, বেঁচে থেকে কি লাভ?

এই তো স্টেশন এসে গেছে। সে ভিতরে প্রবেশ করল। রেল স্টেশনে কেউ কারো মুখের দিকে তাকাচ্ছে না, সবাই নিজের কাজে ব্যস্ত। চট্টগ্রামের ট্রেন ছাড়বে আধা ঘন্টা পরে। মরার জন্য জায়গা খুঁজতে হবে...

• আরে! তুমি সেলিম না ?

• আপনি কে ?

• কেন, তোমার মনে নেই? গত মাসে বাবুলের সঙ্গে আমাদের বাড়ি এসেছিলে ? বাবুল শুধু তোমার কথা বলে.... আরে! এত ভিজলে কি করে ? দাঁড়াও, আমার কাছে একটা বাড়তি জামা আছে। তাড়াতাড়ি জামাটা খোল, এ অবস্থায় কোথায় যাবে?

• মানে... এমনি যাচ্ছিলাম।

• লোকটি সেলিমের চোখের দিকে চেয়ে রইল...।

এমনি... মানে... ? সেলিম, তুমি কেন এখানে এসেছ তা আমার জানার বিষয় নয়, তবে এ অবস্থায় তোমাকে ফেলে যেতে পারব না। চল, আমাদের বাড়ি গিয়ে কাপড়-চোপড় পাল্টাবে, তারপর দেখা যাবে।

আধ ঘন্টা পরে সেলিম বাবুলের জামা-কাপড় পরে এক কাপ চা খেতে বসল। বাবুলের বাবা-মা পাশের ঘরে বসেছিল। হঠাৎ দুই ছেলের মধ্যে ঝগড়া বেধে গেল। বাবুল সেলিমের গায়ে ঘুষি মারতে মারতে বলতে লাগল, বোকা, কাপুরুষ, স্বার্থপর কোথাকার! তোমার বাবা-মা, ভাইবোনের কথা ভেবেছিলে? আমার কথা ভেবেছিলে? তোমার জীবন কি একা তোমার?

৪২৩। কানা মেয়ের গুণ

এক ছিল কাঠুরে। তার একটি মাত্র মেয়ে। মেয়েটি ছোটবেলায় ঝর্ণার মত হাসত, তাই মা ওর নাম রেখেছিল ঝর্ণা। কিন্তু তার বয়স যখন পনের বছর হল তখন ঝর্ণা বুঝতে পারল, সুন্দরী হলেও কেউ তাকে বিয়ে করতে চাইবে না। কারণ ঝর্ণার এক চোখ ছিল কানা। যুবকরা বিয়ের জন্য আসত, কিন্তু তার চোখ দেখে চলে যেত। সবাই বলত, এত সুন্দরী মেয়ে কানা হল কেন? ঝর্ণার দুঃখের সীমা নেই। কিন্তু অবশেষে ঝর্ণা ভাবল, আমার আছে বাবা-মা, আমার আছে স্বাস্থ্য, আমি সব কাজ করতে পারি, আমার চেয়ে দুঃখী কত মানুষ আছে, কেন আমি কেঁদে মরব ?



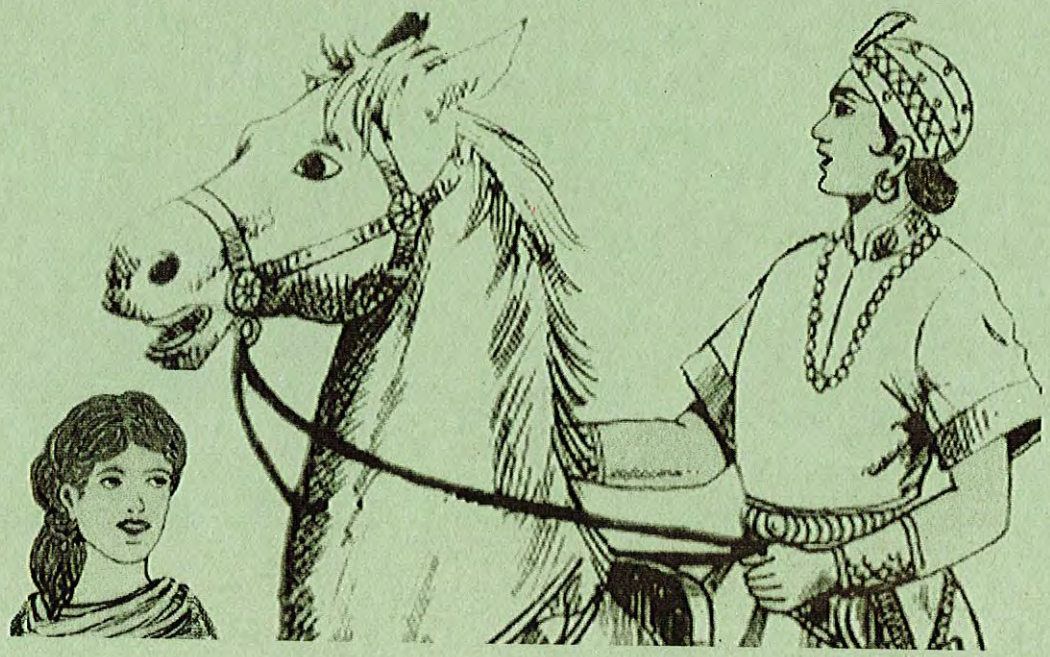
সেদিন থেকে মেয়েটি আবার ঝর্ণার মত হাসতে লাগল, ঝর্ণার মত তার হাসি বিলিয়ে দিতে লাগল।

একদিন কাঠ কুড়াতে গিয়ে তার দেখা হল একটা কুঁজো বুড়ির সঙ্গে। ঝর্ণা তার দিকে মৃদু হাসল। বুড়ি ডাকল, মা, একটু থেমে যাও, আমার মাথা চুলকাচ্ছে, কি আছে একটু দেখ তো ? ঝর্ণা বারান্দায় বসে বুড়ির মাথার উকুন বাছতে লাগল। বুড়ি জিজ্ঞাসা করল, কি পেলে মা ? ঝর্ণা তাকে লজ্জা দিতে চাইল না। বলল, এই তো, চুলের মধ্যে এত রত্ন থাকলে, চুলকাবে না কেন? বুড়ি বলল, মা, দোয়া করি সুখী হও।

লাগল। তাদের সংখ্যা এত বেশী যে, বিছানা দেখাই যাচ্ছিল না। বুড়ি জিজ্ঞাসা করল, কি পেলে মা ? ঝর্ণা তাকে লজ্জা দিতে চাইল না। বলল, এই তো, বিছানার ভিতরে এত মনি-মুক্তা থাকলে, তার উপরে কি শোয়া যায় ? বুড়ি বলল, মা, দোয়া করি তোমার দুটি চোখ তারার মতই জ্বলুক।

এবার ঝর্ণা হাসতে গিয়ে পারল না। হঠাৎ তার মনে পড়ল নিজের কানা চোখের কথা। কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে গেল। তবে বাড়ি পৌছবার আগে তার চোখের পানি শুকিয়ে গিয়েছিল। কাঠের বোঝাটা নামিয়ে চোখ তুলে দেখল, সাদা ঘোড়ায় চড়ে এক যুবক তার দিকে তাকিয়ে আছে। ঝর্ণা তার চোখ মুখ দেখে অবাক হয়ে বলল, তুমি এত সুন্দর হলে কি করে?

যুবকটি বলল, তুমি বরং এত সুন্দরী কি করে হলে? তোমার দু'টি চোখ আকাশের তারার মত, আর তোমার হাসি দেখলে চাঁদের পরীরাও হিংসা করবে। তোমার ঘরে আয়না নেই? এই দেখ।



৪২৪। কার কত দাম

রেজার বয়স দশ বছর। দু'বছর আগে তার বাবা মারা গিয়েছে । মা পেটে-ভাতে তাকে কালু মিয়ার কাছে গরু চরাতে দিয়েছে। সকালে গরু নিয়ে মাঠে যায়। যাবার পথে তার দেখা হয় স্কুলের ছাত্রদের সাথে। তারা নীল পোশাক পরে স্কুলে যায়। রেজা গরু নিয়ে যায় স্কুলের মাঠের পাশ ঘেঁষে। সময় সময় গরু মাঠে পায়খানা করে। ছাত্ররা বিরক্ত হয়ে যায়। বলে, তোর গরুর গোবর কুড়িয়ে নিয়ে যা। তখন সবাই হাসে। আজ তেলা মিয়ার ছেলে গোলাম তাকে একটা গুতো দিয়ে বলেছে, রাখালের পোলা, আমাদের মাঠে আসিস কি করতে? রেজা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল।

মাঠে রোজ আলীর সাথে তার দেখা হয়। সে তার দু'বছরের বড়।



আজ আলী যখন ডাকলো খেলা করার জন্য তখন রেজা উত্তর দিলো না। শেষে কাঁদতে কাঁদতে ছাত্রদের কথা বললো। আলী বললো,

দিলো। তখন এক দিন আলী বললো, চল আমার ওস্তাদের কাছে যাই। ওস্তাদ রেজাকে নিজের বাঁশী দিয়ে বললো, যা পারো আমাকে শোনাও। রেজা যেই বাঁশীতে ফুঁ দিল। তার সুরে এত পুলকিত হলো যে প্রাণ ঢেলে বাজাতে লাগল। ওস্তাদ আধ ঘন্টা ধরে নিস্তব্ধ হয়ে শুনলো। তার চোখ ছলছল করছিল। শেষে আলীকে দেখিয়ে বললো,

• তোমার ওস্তাদকে প্রনাম করো। তারপর বললো, ওই বাঁশীটা আমার নিজের, তবে এখন তোমার কাছ থেকে ওটা ফেরত নিলে আমার পাপ হবে। ওটার দাম কিন্তু বিশ টাকা নয়, ওটার দাম এক হাজার টাকা। দাম দেবে কি করে? রেজার মুখ অন্ধকার হয়ে গেল, তার চোখে পানি এল। শেষে ওস্তাদের দিকে চোখ তুলে বলল,

• ওস্তাদ আমি শপথ করছি একদিন বাঁশীটার দাম শোধ করে দেব।

• রেজা বিশ টাকা এনেছিল। তার কাছ থেকে ওস্তাদ একটা টাকা নিয়ে বলল, দোয়া করি খোকন বড় হও। তোমার ঋণ শোধ হয়ে গেল।

সেদিন থেকে রেজা মাঠে যাবার সময় বাঁশী বাজায়। একদিন হেডমাস্টার আলীকে বলল, রেজার গরু কয়টা দেখ। ওকে আমার একটু দরকার। স্কুলের ঘন্টা বারান্দায় ঝুলানো ছিল। স্যার বললো, তোমার ডাংগুলি দিয়ে ঘন্টা বাজাতে পারো? রেজা গুলি বের করে ছুঁড়তে লাগল। এক, দুই, তিন..... পরপর দশ বারই ঘন্টাটা বাজলো। একবারও ভুল হল না। ছাত্ররা অবাক হয়ে লাইন করে দাঁড়াল। স্যার বলল, আজ জাতীয় সঙ্গীত রেজা বাজাবে।

তিনশ ছেলেমেয়ে নিস্তব্ধ হয়ে চোখ মোটা করে শুনতে লাগল।

৪২৫। মধুখালীর কিশোর শহীদ

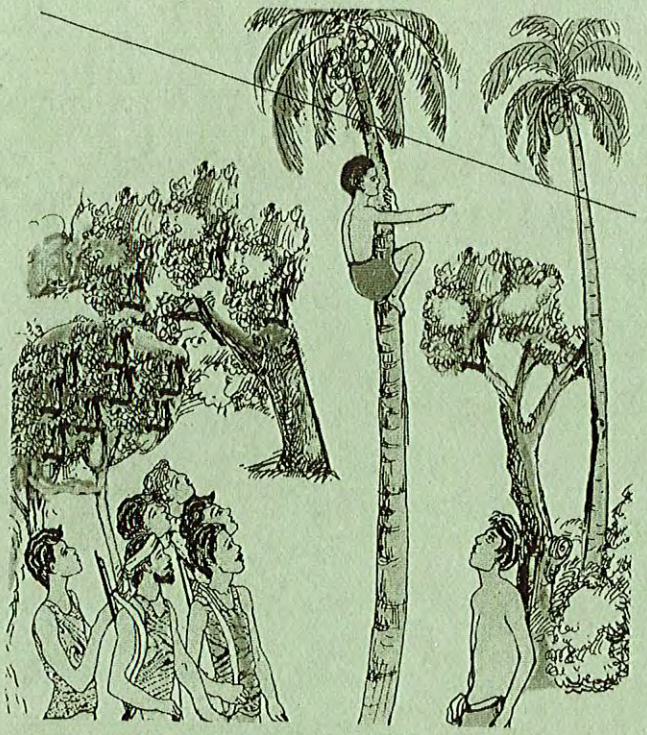
বাড়ি মুধুখালী, বয়স ১২ বছর, নাম আসাদ। মুক্তিযোদ্ধারা যখন রাত্রে





গ্রামেআসত সে তখন তাদের কাছে বসত। তাদের সব কথা শুনত। তখন দেশ স্বাধীন করার জন্য তাদের সঙ্গে বিলে-জঙ্গলে গিয়ে তার যুদ্ধ করার ইচ্ছা হত। মুক্তিযোদ্ধারা ছিল সাতজন। এই বিল অঞ্চলে তাদের সবারই জন্ম। তারা পণ করেছিল তাদের এলাকায় পাক সৈন্যদের ঢুকতে দেবে না। রাত্রে মাইন বসিয়ে তাদের জীপ ও ট্রাক উড়িয়ে দিত, তারপর মেশিন গান দিয়ে তাদের শেষ করে ফেলত। দিনের বেলা তারা না খেয়ে থাকলেও গ্রামের কাছে আসত না, যাতে গ্রামবাসীদের উপরে দোষ না পড়ে। একদিন কিন্তু তারা দিনের বেলায় গ্রামে এল। তারা ছয়জন হয়ে গিয়েছিল। পাক সৈন্যরা তাদের ঘিরে ফেলেছিল, তাদের একজন মারা গিয়েছিল। বাকি ছয়জন পাক সৈন্যদের চক্র ভাংতে পারছিল না।

দলের প্রধান বলল, এক্ষুণি গ্রাম ছাড়তে হবে। নয়তো গ্রামবাসীরা আমাদের সঙ্গে মরবে। আসাদ সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। বলল, দাঁড়াও, আমি বলে দিচ্ছি কোন পথে যেতে হবে। এ কথা বলে সে বিদ্যুৎ বেগে



এক নারিকেল গাছে উঠে চারিদিকে তাকাতে লাগল। একটা গুলি তার মাথার উপর দিয়ে সোঁ ক'রে চলে গেল। আসাদ আঙ্গুল দিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম দিক দেখিয়ে বলল, ওরা আসছে। আর একটা গুলি তার পাশ দিয়ে গেল, তারপর আর একটা। আসাদ বলল, শুধু উত্তরে কেউ নেই। কথাটা শেষ করতে পারল না। আস্তে আস্তে গাছ থেকে খসে পড়ল একটা পাকা ফলের মত। তার বুক থেকে রক্ত ঝড়তে লাগল। দলের নেতা তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল,

– আসাদ, আমরা তোমার গা ছুঁয়ে শপথ করছি, তোমার মৃত্যু বিফলে যাবে না। তারপর হুকুম দিল, চল, উত্তর দিকে যাই। বলে, নিজের চোখ মুছল।

৪২৬। মা শিয়াল

মা শিয়াল শিকার করে ফিরে আসছিল। আজ তার তিনটি বাচ্চা পেট ভরে দুধ পাবে। হঠাৎ ঝোপের মধ্যে একটা চাপা কান্না শুনতে পেল। এক বাচ্চা শিয়াল কাঁদছে। ওর মা শিকারীদের ফাঁদে পড়ে মারা



গেছে। বাচ্চাটিও ক্ষুধায় মরে যাচ্ছে। মা শিয়ালের মায়া হল। নিজের দুধ খেতে দিল। বাচ্চাটি পেট ভরে দুধ খেল। তারপর মা শিয়ালের কোলে ঘুমিয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ ধরে ঘুমাল।

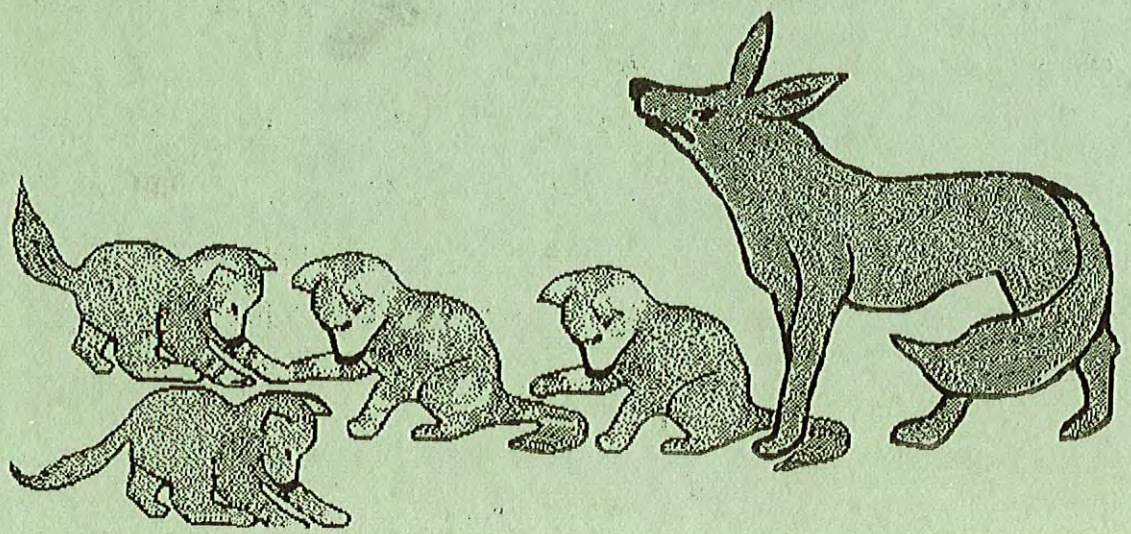
মা শিয়াল উঠতে যাচ্ছিল, এমন সময় তার কানে ভেসে এল এক পরিচিত ভয়ানক আওয়াজ, শিকারী কুকুরের গর্জন। সেই কুকুর একবার শিয়ালের গন্ধ পেলে তার পিছু ছাড়ে না। মা শিয়াল বাচ্চাটিকে মুখ দিয়ে আঁকড়ে ধরল ও তার সমস্ত শক্তি দিয়ে পালাতে লাগল। কুকুরের ডাক ক্রমশঃ কাছে আসতে লাগল।

মা শিয়াল নিজের বাচ্চাগুলোর কথা ভাবল। তাদের বাঁচাবার জন্য ও নিজে বাঁচবার জন্য এই বাচ্চাটাকে ফেলে যেতে হবে। কিন্তু তাকে ছাড়তে মন চায় না। মা শিয়াল প্রাণপনে নদীর দিকে দৌড়াল ও পানিতে ঝাপিয়ে পড়ল। স্রোতে ভেসে গেল, অনেক দূরে ভেসে গেল। তার খুব কষ্ট হচ্ছিল, বাচ্চাকে নিয়ে ও-পারের ডাঙ্গায় উঠতে পারছিল না, কষ্টে শ্বাস টানতে পারছিল না। তবু বাচ্চাকে ছাড়ল না। তার সমস্ত শক্তি দিয়ে সাঁতার কাটতে লাগল। ক্লান্তিতে পা অবশ হয়ে যাচ্ছিল। শেষে ভাগ্যক্রমে একটা গাছের গুড়ি আঁকড়ে ধরে বাচ্চাকে নিয়ে ডাঙায় উঠতে পারল। বাচ্চাটি বেঁচে গেল।

এবার কিন্তু মা শিয়াল ঐ বাচ্চার জন্য এত কষ্ট করার পরে, এত বড় বিপদে পড়ার পরে, তাকে আর ফেলে যেতে পারল না।

এখন মা শিয়ালের ঘরে চারটি বাচ্চা। কোনটা নিজের আর কোনটা পরের সে আর দেখে না। শুধু পড়শীরা বার বার জিজ্ঞাসা করে, তোমার তিনটি বাচ্চা ছিল না ? চারজন হল কি করে ? ঐ বাচ্চাটা কার?

মা শিয়াল উত্তর দেয়, কই, এরা সবাই আমার বাচ্চা।



৪২৭। মায়ের খোঁজে

• মামা, এই তিন মাস হল, মা কোন চিঠি দিচ্ছে না। আমি গিয়ে খবর নিয়ে আসি।

• পাগল কোথাকার। দিল্লি কোথায় জানিস ? আর তুমি এখনো ছেলে মানুষ।

• আমার বয়স এগারো বছর পেরিয়ে গেছে। আর বাবা মরার সময় বলে গেছেন, মাকে যেন আমি দেখি। তাছাড়া তুমি আর কতদিন আমাকে খাওয়াবে?

• তোমাকে এসব ভাবতে হবে না।

কিন্তু পরদিন সকালে হোসেনের খাটের উপর মামা একটা কাগজ পেল। তাতে লেখা ছিল, মামা, আমাকে মাফ করো, আমার যেতে হবে। ইতি, হোসেন।

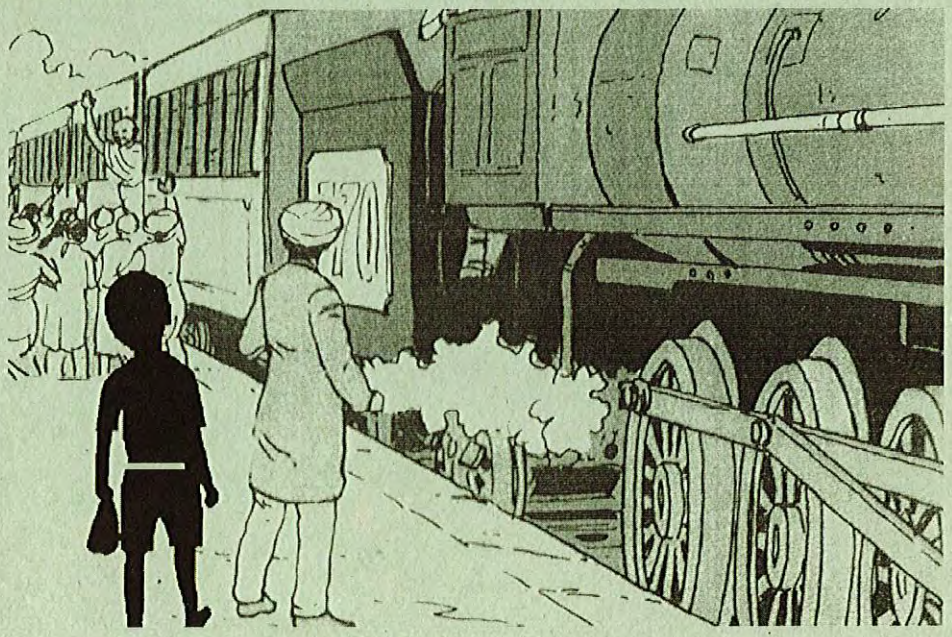
বাসের কন্ডাক্টার হোসেনের কথা শুনে হাসল।

• দিল্লি ! দিল্লি কোথায় জানিস ? একেবারে ভারতের মাঝে।

• আমার যেতে হবে।

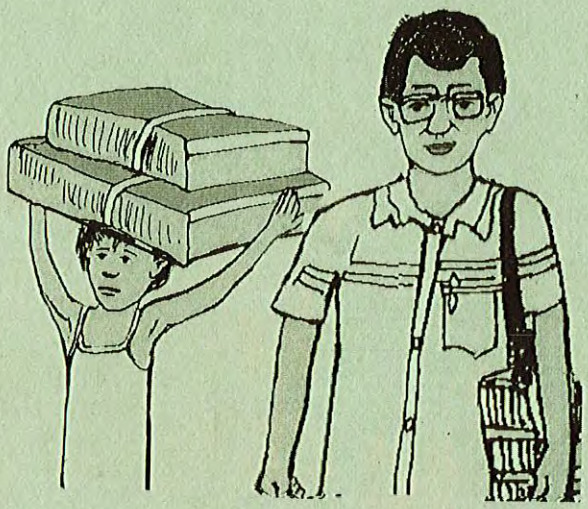
• তোমার পাসপোর্ট নেই।

বেনাপোল দিয়ে তোমাকে



হাতে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। কিন্তু তার কথা কেউ বোঝে না, আর তারা হিন্দি ভাষায় কি উত্তর দেয় হোসেন তা বুঝতে পারে না। অনেক অনেক লোক থামিয়ে ঠিকানা দেখাল। তারা সবাই ব্যস্ত, কেউ সাড়া দেয় না। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। এবার হোসেনের ভয় করতে লাগল। ভাবল, বাড়ি ফিরে যাই। এই চিন্তা করে স্টেশনে ফিরে গেল। হাওড়ার ট্রেন খুঁজল। হঠাৎ হোসেনের মনে পড়ে গেল বাবার কথাঃ- হোসেন, আমি মরে যাচ্ছি, মাকে তোমাকেই দেখতে হবে... হোসেন ট্রেনে উঠল না। আবার লোকদের থামিয়ে থামিয়ে ঠিকানা দেখাতে লাগল.....

হঠাৎ একটা লোক ট্রেন থেকে নেমে এল। তার হাতে তিনটি ব্যাগ, সামলাতে পারছে না। হোসেন কাছে গিয়ে বলল, দেন, আমাকে দুটো দেন। লোকটি তার মাথায় দুটি ব্যাগ চাপিয়ে দিয়ে বলল, তুমি বাঙ্গালী ? হোসেনের মুখে হাসি ফুটল। বলল, হ্যাঁ, আমার বাড়ি যশোর।



• লোকটি স্টেশন থেকে বেরিয়ে হোসেনকে পাঁচ টাকা দিতে গেল। হোসেন বলল, আমি টাকা নেব না। তারপর হঠাৎ সারা দিনের ভয় ও নিরাশা তাকে পেয়ে বসল। লোকটাকে আঁকড়ে ধরে কেঁদে ফেলল ও তার মায়ের ঠিকানাটা দেখাল। লোকটি বলল, জায়গাটা অনেক দূরে। আজ যেতে পারবে না। চল, রাত্রে আমাদের বাড়িতে থাকবে। সকালে বাসে উঠিয়ে দেব। হোসেন হাফ ছেড়ে বাঁচল। মনে মনে আবার বলল, বাঙ্গালীদের দাম

৪২৮। মানুষ হওয়ার জ্বালা।

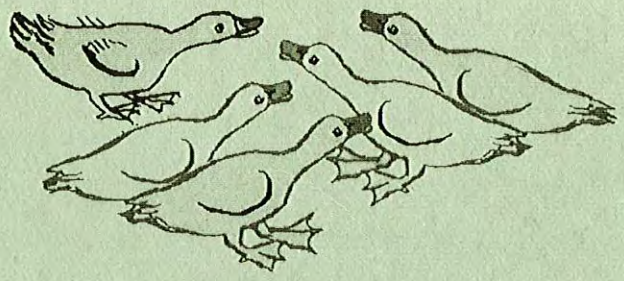
ফরিদপুর অঞ্চলে এক বিরাট বিল আছে। বিলের মধ্যে মানুষের তৈরী অনেক ছোট ছোট পাহাড়, প্রত্যেকটির উপরে দশ পনেরটা ঘরের একটা পাড়া। বর্ষা হলে বিল ভরে যায়। এই সব পাড়ার চারিদিকে পাঁচ ছয় মাস ধরে শুধু পানি আর পানি । সে কয় মাস নৌকা ছাড়া চলাফেরা করার উপায় নেই। ছেলেমেয়েরা নৌকা বেয়ে স্কুলে যায়। বয়স্করা নৌকায় করে বাজারে যায়, মাছ ধরে, ধান কাটে, ধান ঘরে



আনে। সেই এলাকায় বাস করত অমল, তার বাবা-মা ও তিনটি ভাইবোন।

• অমলের বয়স তের বছর । সে ক্লাস সিক্সে পড়ে। তার মত বয়সী যারা, তারা প্রায় কাজ করতে শুরু করেছে। তাদের সঙ্গে অমলের দেখা হয়। তারা বলে,

• দেখ অমল, রাত্রে বড়শি পেতে কত মাছ ধরেছি! অমল, এই দেখ, পঞ্চাশ টাকার নোট! আমি নিজেই রোজগার করেছি! আর আমার জামা দেখেছ? ষাট টাকা দাম। আমার টাকা দিয়ে কিনেছি!



এক সপ্তা গেল। একদিন ভোরে অমলের বাবা বিল থেকে ফিরে এসে শুইয়ে পড়ল। তখন অমল আস্তে আস্তে লগিটা নিয়ে নৌকায় উঠল। ধানের মধ্যে দিয়ে নৌকা ঠেলতে ঠেলতে মামার বাড়ি গেল। ফিরে এল দু' ঘন্টা পরে। ফিরতে ফিরতে বড় বড় শামুক কুড়িয়ে আনল। বাবা দুপুরে হাঁসের ছানা দেখতে পেল। মুখ তার অন্ধকার হয়ে গেল। শোন অমল। আমাদের নৌকার তলে দুটো তক্তা পঁচে গেছে। মেরামত না করা পর্যন্ত আর কোনদিন তুমি ঐ নৌকায় বিলে যাবে না। আমার কথা মনে থাকবে তো?

• বাবার মুখে যেন আষাঢ়ের মেঘ জমেছে। সেদিন থেকে শামুক আর কচুরী আনার জন্য অমল ভোরে ওঠে ও কাকাদের নৌকায় বিলে যায়। ফিরে আসে সুর্য ওঠার আগে। পাঁচটি ছা যে এত খাবে তা অমল ধারনা করতে পারেনি। মা বাবাকে বলে, দেখেছ, আজকাল ছেলেটা কোন সময়ে বিলে যায়? দিন দিন তার বেশী সময় লাগে।এই ঠান্ডার মধ্যে তার যে কষ্ট করতে হয় !

• কিছু বলো না। কাজ করতে চায়, করুক না। তোমার ছেলে মানুষ হয়েছে।

কিন্তু এক দিন সকালে মা বাবাকে জাগাল,

ওগো ওঠ, ছেলেটা এখনও ফেরেনি। আজ সে ওর কাকার নৌকা পায় নি, আমাদের নৌকায় গেছে।

বাবা চমকে উঠল। বাইরে এসে দেখল ঘাটে কোন নৌকা নেই। চারিদিকে তাকাল। বেশ দুরে বিলের মধ্যে সম্ভুদের বাড়ি। সে পানিতে

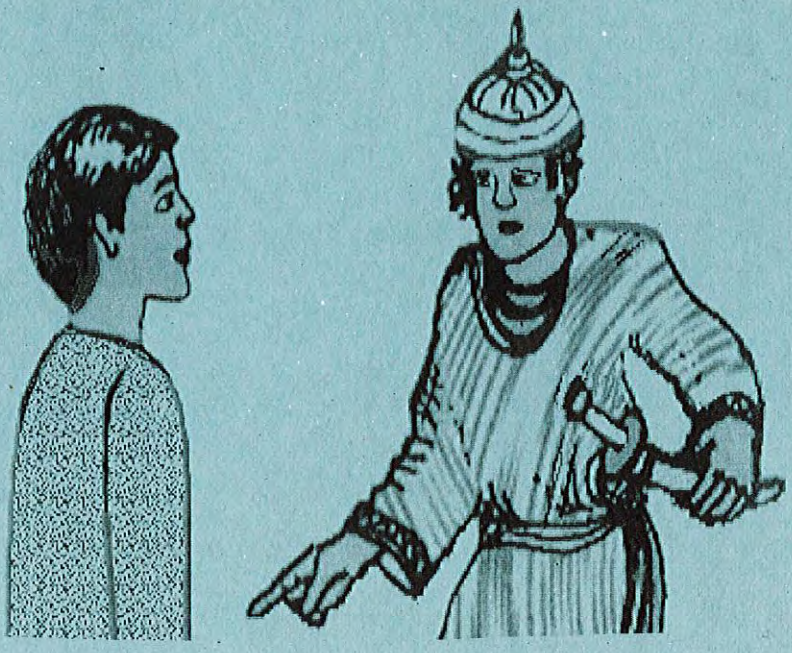
৪২৯। মানুষের জাত ১

আড়াই হাজার বছর আগের কথা। গ্রীস দেশে দিওনিস বলে এক রাজা ছিল। সে তার শক্তিশালী বন্ধুদের নিয়ে রাজত্ব করত ও তাদের সম্পদ বাড়ানোর জন্য দেশের মানুষকে শোষন করত। কেউ প্রতিবাদ করলে বেশীদিন বাঁচত না। তাকে নিষ্ঠুর ভাবে খুন করা হত। শেষে সবার ভয় এমন হল যে, কেউ মুখ খুলতে সাহস পেত না। একজন মাত্র রাজার নিন্দা করতে লাগল। তার নাম ইলিয়াস, রাজ্যের সেনাপতি। কিন্তু সবাই জানত সে জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছে, একদিন রাজা ঠিকই প্রতিশোধ নেবে।

• ইলিয়াসের এক বন্ধু ছিল, তার নাম মির্জা। একদিন সন্ধ্যায় সে তার কাছে এল।

• ইলিয়াস, তোমার পোষাক পরছ কেন? কোথায় যাবে?

• রাজার কাছে যাচ্ছি মির্জা। এবার একটা বুঝাপড়া হবে। আমি জানতে চাই, একটা মানুষ স্বাধীনভাবে এই দেশে বাঁচতে পারে কি না, আর তার অত্যাচার কত দিন চলবে।



• ইলিয়াস, এই কথা জানার জন্য রাজার কাছে যাওয়া লাগবে না। এই দেশে কোন মানুষ স্বাধীনভাবে

তুমি সবাইকে জানাবে যে, এই দেশে একটা মানুষ ছিল, সে মনে করত যে, খরগোসের মত বেঁচে থাকার চেয়ে মরাই ভাল। আর মরার সময়ে সে বলে গেছে যে, তার মত লক্ষ লক্ষ মানুষ এই দেশে আছে। একদিন তারা মানুষ হবার জন্য রুখে দাড়াবে। তাদের সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা কোন রাজার নেই। ইলিয়াস তখনই রাজার দরবারে গিয়ে উঠল। ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই রাজা রুক্ষ স্বরে তাকে জিজ্ঞাসা করল, সেনাপতি, তুমি না কি হাটে-ঘাটে সবার সামনে রাজার নিন্দা করে বেড়াও? এ কথা কি সত্য ?

• হ্যাঁ মহারাজ, এই কথা সত্য।

• তুমি জান না যে রাজার নিন্দা করা দণ্ডনীয় অপরাধ?

• মহারাজ, এই আইন করেছেন আপনি, আমাদের পরামর্শ তো নিলেন না। যে রাজ্যে কেউ সত্য কথা বলতে সাহস করে না সে রাজ্য বেশীদিন টেকে না।

• কি বলতে চাও তুমি ? কি তোমার সত্য কথা?

• আপনি এই দেশের মানুষের উপরে যত অত্যাচার করেন, কোন রাজা তত অত্যাচার করেনি... তবে তার জন্য আমি আপনাকে ক্ষমা করতে পারতাম। কিন্তু আপনি আর একটা অপরাধ করছেন, যার জন্য এই জগতে কোন ক্ষমা নেই। আপনি নিষ্ঠুর ভাবে মানুষের মুখ বন্ধ করে রেখেছেন, যেন কেউ প্রতিবাদ করতে না পারে। এই নিষ্ঠুরতা দেশের মানুষকে নষ্ট করে ফেলেছে। সবাই প্রাণের ভয়ে মিথ্যাবাদী, কাপুরুষ আর তোষামোদকারী হয়ে যাচ্ছে। এমন দেশে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল!

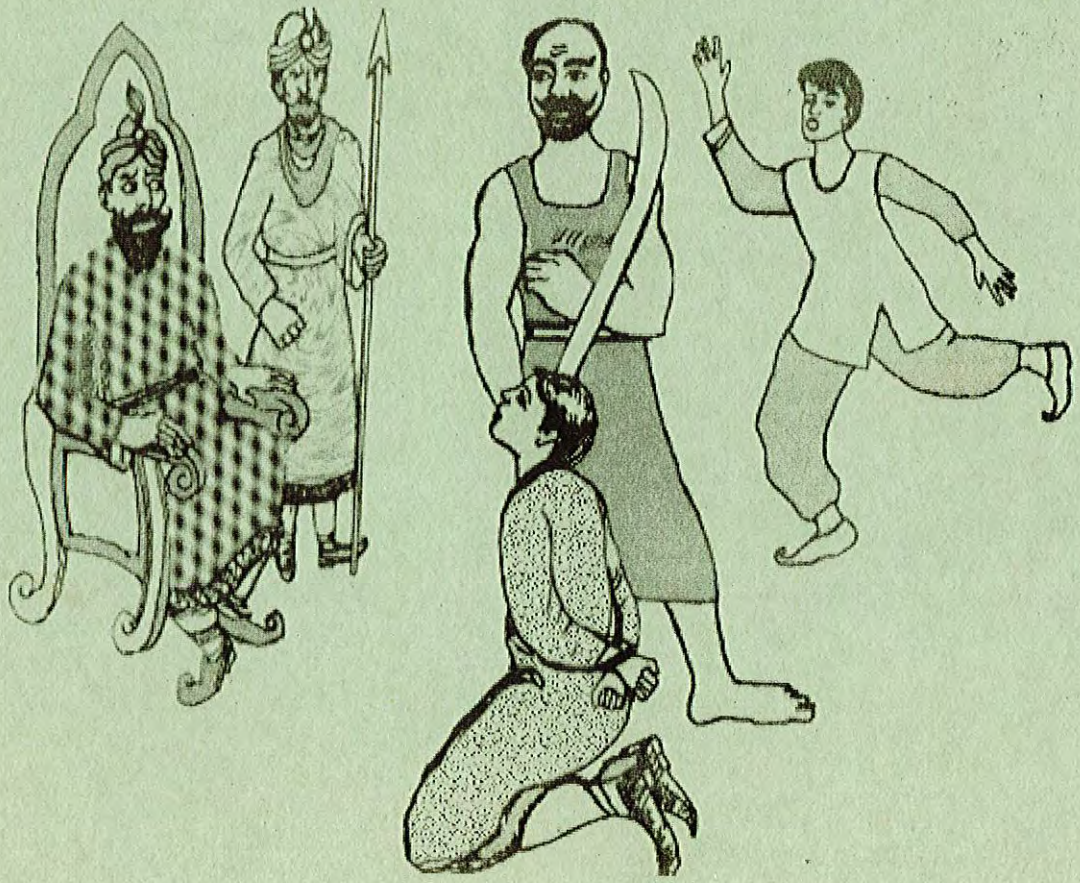
• বেশ। মরতে যখন চাও তখন মরবে। প্রহরীরা, ওর পোষাক, তলোয়ার সব খুলে নাও, ওকে কারাগারে বন্দী করে রাখ, পরে ওর মৃত্যুর দিন ধার্য্য করা হবে।

৪৩০। মানুষের জাত ২

ইলিয়াস মা-বোনের কাছে চলে গেল। ত্রিশ দিনের দিন ফেরার কথা ছিল। ইলিয়াস ফিরল না। রাজা মিরজাকে জেলখানা থেকে ডেকে আনতে হুকুম দিল।

• তুমি এত বোকা কি করে হলে, যুবক? এই বয়সে তোমাকে জল্লাদের হাতে তুলে দিতে আমার দুঃখ হয়, কিন্তু তোমার মত বোকা মানুষ এই দুনিয়ায় বেঁচে থেকে কারও লাভ নেই।

• মহারাজ, আমি বোকা নই, আর আমার বন্ধু ইলিয়াস বিশ্বাস ঘাতক নয়। সে যদি না ফেরে অবশ্যই একটা অনিবার্য কারণ



আছে, আমার মৃত্যুর পরে তা জানতে পারবেন। তবে যাই হোক, আমার বন্ধুর জন্য মৃত্যুবরণ করতে আমার দুঃখ নেই।

• জল্লাদ তার কাজ করতে যাচ্ছিল, এমন সময় আধমরা অবস্থায় তার বন্ধু ইলিয়াস এসে হাজির হল।

• বন্ধু আমার... পথে বড় বিপদে পড়েছি, ফিরে আসতে পেরেছি, এ আমার ভাগ্য... যাক, আমার দেশ, আমার মা-বোনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসতে পেরেছি, তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ বন্ধু!... এই বলে সে ক্লান্তিতে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

রাজা অনেকক্ষণ নির্বাক হয়ে রইল। শেষে প্রহরীদের বলল,

• ওকে সুস্থ করে তোল... তারপর দু'জনকেই ছেড়ে দাও... এদের মত এক বন্ধু পাবার জন্য আমার ধন-দৌলত, রাজমুকুট, আমি সব দিতে রাজি হতাম। আমার রাজ্যে এমন জাতের মানুষ আছে, আমি আগে তা জানতাম না। এদের সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা কোন রাজার নেই। সেনাপতি ইলিয়াসকে তার পোষাক ও আর তলোয়ার ফিরিয়ে দাও। দিয়ে এই কথা বলবে যে, রাজার নিন্দার জন্য মৃত্যুদন্ড, যে আইন দু' বছর আগে জারি করেছি, সেই আইন বাতিল করে দিলাম।

৪৩১ মরণ নানী ১



মরণ নানী দুঃখের চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে দিয়ে রান্নায় মন দিল। কিন্তু ওসব চিন্তা ভারি পাজি, কিছুতেই পোষ মানে না। মনের এক প্রান্ত থেকে তাড়িয়ে দিলে অন্য প্রান্তে গিয়ে হানা দেয়।

• মরণ হলে বাঁচি। মরণ আসে না কেন ? এই তো, আগুন আবার নিভে গেল। নিভে যাক, রান্না করে কি হবে! আর রান্না করব কার জন্য? গতকালের মত এক টাকার মুড়ি কিনে খাব। এই বলে মরণ নানী রান্না ঘর থেকে এসে খাটে শুয়ে পড়ল। চোখের পানিতে বালিশ ভাসিয়ে দিতে লাগল। ছেলেটা টাউনে চলে গিয়েছে, এই এক বছর হল। ভালো করেছে তো। আর কত দিন কাজের জন্য রোজ দু'ঘন্টা যাওয়া-আসা করবে? বউ-ছেলেমেয়ের সঙ্গে থাকার জন্য এক বিন্দু সময়ও পেত না। সবাইকে টাউনে নিয়ে গেছে। এখন তো নাতি-নাতনিরা বড় হয়ে যাচ্ছে, তারা ভাল স্কুলে পড়বে,

যা, খিচুড়িও তাই, পেটে ক্ষুধা কামড় দিলে ওরা ভাল-মন্দ কি বুঝবে, মরুক গে। রান্না শেষ হয়ে গেল। সকালের শীত কমে গেছে। মরণ নানী বলল, কলে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে ফেল। তারা দৌড়ালো। এরই মধ্যে সে তিনটে থালায় গরম খিচুড়ি বেড়ে দিল। তারা এসে পিড়েতে

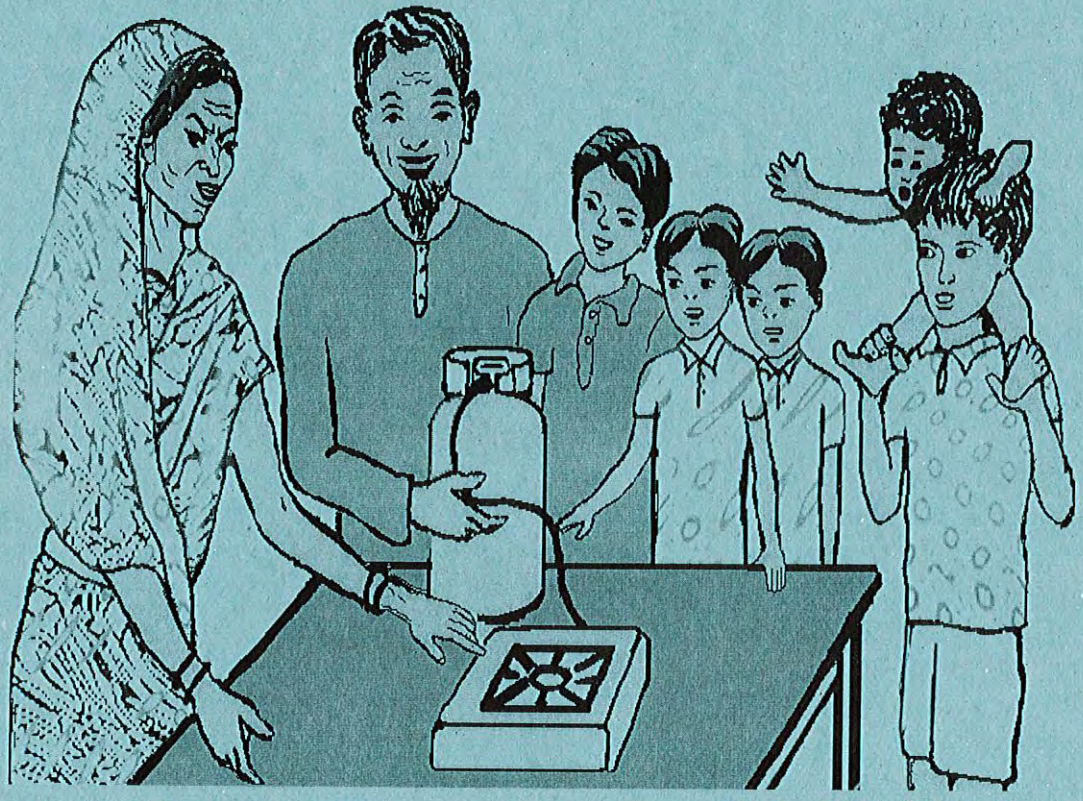


বসে খেতে শুরু করল। কিন্তু... ঐ ছেঁড়া গেঞ্জি পরা ছেলেটা জুটলো কোথা থেকে ?

- মরণ হলে বাঁচি ! তুই এলি কেন ?

৪৩২। মরন নানী ২

বছরের শেষে একদিন সন্ধ্যায় নানীর বাড়ীতে এল এক রিক্সাওয়ালা। এসে বলল, চেয়ারম্যান সাহেব যেতে বলেছেন, উঠে আসেন। ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার আর গ্রামের মোড়ল-মাতব্বররা তার জন্য অপেক্ষায় ছিল। নানী ঢুকলে সবাই দাঁড়িয়ে হাততালি দিতে লাগল। তারপর বুড়িকে সবার সামনে বসিয়ে চেয়ারম্যান সাহেব ভাষণ দিল।



তারপর পাড়ার মোড়লরা ভাষণ দিল। তারপর গ্রামের লোকেরা তাকে একটা গ্যাসের স্টোভ উপহার দিল, আর সারা বছরের জন্য গ্যাসের বন্দোবস্ত করে দিল। এছাড়া সুন্দর ফ্রেমে বাঁধানো একটা অভিনন্দন

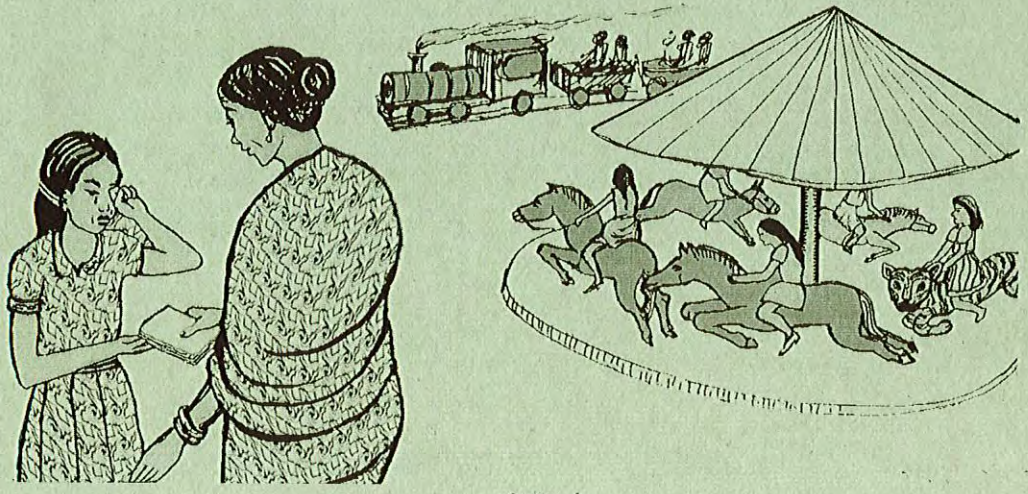
পত্র পড়ে শুনিয়ে তার হাতে দিল।

মরণ নানী তাদের শুকরিয়া জানানোর জন্য উঠল। সবার মুখের দিকে চেয়ে দেখল। চোখ মুছল। তারপর বলল, মরণ হলে বাঁচি ! তোমরা আমাকে এই গ্যাস ও স্টোভ দিয়ে ভাল করেছ। তবে তোমাদের বক্তৃতা শুনে বুঝলাম যে, আমার মত বয়স তোমাদের হয়নি। তোমাদের বকবকানির মর্ম হল এই যে, আমি না জানি কত মহত কাজ করে যাচ্ছি। সে সব গুড়ে বালি। ঐ দেখ, তোমাদের মধ্যে ডাক্তার আছে, ওকে জিজ্ঞাসা কর গত বছর কয়বার তার ওষুধ নিতে গেছি। এই বছর কিন্তু একবারও যাইনি। গত বছর আমি মরতে যাচ্ছিলাম, কারণ, আমাকে বেঁচে থাকতে কেউ বলতনা। এই বছর হঠাৎ ঐ দশ-পনরজন বানর এসে বলেছে, মরণ নানী, তুমি মরে গেলে আমরা কাঁদব। তোমাকে ছাড়া আমাদের চলে না। সেজন্য আমি বেঁচে গেলাম। ঐ বাচ্চারা আমার কাছ থেকে কি পেয়েছে জানি না। তবে ওরা আমাকে কি দিয়েছে তা জানি। ওরা আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এ কথা যদি বুঝতে না পার, তাহলে... মরগে যা!

৪৩৩। নানীর দান।

রিপাদের বাড়িতে নানী থাকে। এসেছিল পাঁচ বছর আগে নানার মৃত্যুর পর। রিপার মা তার একমাত্র মেয়ে নয়, আরও দু'জন আছে। তবে এখানে এসে সে রিপার বাপের জালে পড়ে গেছে, ছাড়াছাড়ি নেই। চারজন ছেলেমেয়ে নানীকে ভালবাসে, হাসলে তাকে ভালবাসে, রাগ করলেও ভালবাসে। বাবা-মায়ের কাছে যা পায় না তা নানীর কাছ থেকে আদায় করে নেয়। এই ধর, আজ রিপার বয়স এগার বছর পুর্ণ হল। তা কে জানত! রিপা তো জানতই না। মাও ভুলে গিয়েছিল, বাবাও ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু নানী ভুলেনি। সকালে ঘুম থেকে উঠার সাথে সাথে নানী রিপার কাছে এসে বলল, শুভ জন্মদিন রিপা, স্কুলের পর আমরা দুজনে শিশুপার্কে বেড়াতে যাব, আর রাতের জন্য তো পিঠার ব্যবস্থা আছেই। এমন নানীকে না ভালবেসে কি পারা যায় ? রিপা স্কুল থেকে ফিরল চারটার সময়। সঙ্গে সঙ্গে রিক্সায় উঠে নানীর সঙ্গে রওনা হল।

আজ নানী রিপার পাশে নাগরদোলায় চড়ল, তার সঙ্গে হাসাহাসি করল,



তার সঙ্গে ভয় পেল, তার সঙ্গে হৈচৈ করল। রিপা অবাক হয়ে গেল... সন্ধ্যার সময় তারা দু'জনে এক নিরিবিলি জায়গায় বসে একটা পেপসির অর্ডার দিল। তারপর হঠাৎ নানীর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। রিপার দিকে চেয়ে তার চোখ ছলছল করতে লাগল।

• রিপা, তুমি বড় হয়ে গেছ। যদি তোমাকে একটা গোপন কথা বলি, তুমি কি তা গোপন রাখতে পারবে ?

• একশ বার পারব !

• তোমার আর একটা জন্মদিন আমি দেখতে পাব না।

• কেন? কি করে জানলে ?

• আমার এক ডাক্তার বন্ধু আছে, সে বলেছে। খুব জোর আর ছয় মাস বাঁচতে পারি।... না, রিপা, কেঁদো না, আমার মত সুখী মানুষ জগতে খুব কমই আছে।

• তোমার জন্য কাঁদছি না নানী, নিজের জন্যই কাঁদছি।

• কেঁদো না। তোমাকে একটা জিনিষ দিয়ে যাচ্ছি। সেটা তৈরী করতে আমার লেগেছে পঁচাত্তর বছর। তুমি সেটা এমনি পেয়ে যাবে। এই নাও তোমার জন্মদিনের উপহার। এটা হল আমার জীবনের খাতা। এটা পড়ে তুমি এক সময় বুঝতে পারবে কিসের অভাবে অধিকাংশ মানুষের মন কাঁদে।

রিপা নানীর বুকের মধ্যে মাথা গুজে অনেকক্ষণ কাঁদল। তারপর দু'জনে আবার রিক্সা উঠে একসঙ্গে বাড়ী গেল। সেই ছয় মাস ধরে কত খেলা, কত ফূর্তি ! নানী তার শেষ জীবনের প্রতি মিনিট হেসে-খেলে কাটাল।

• এক রাত্রে রিপাকে শুভরাত বলতে গিয়ে নানী জিজ্ঞেস করল, আমার খাতা পড়েছ?

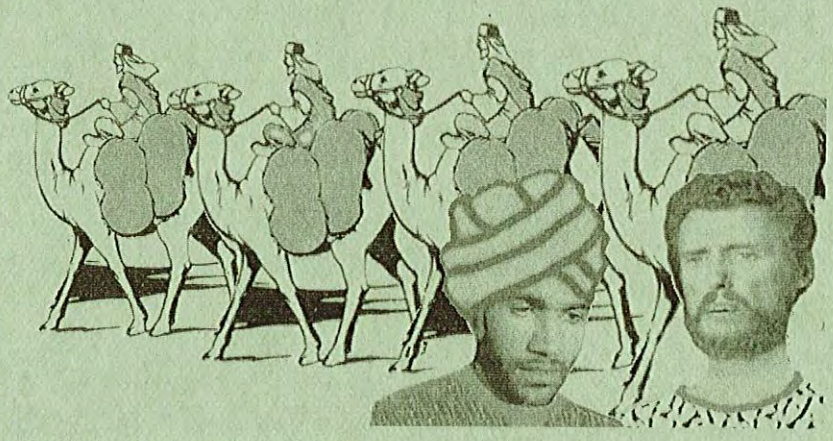
• প্রত্যেকদিন পড়ি নানী, আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। শুনবে ?

৪৩৪। অপব্যয়ী ব্যবসায়ী ১



বাগদাদ শহরে এক খলিফা ছিল। তার একমাত্র কন্যা নূরজাহান। নূরজাহান নামের অর্থ জগতের আলো। নূরজাহান খুব সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী। লেখাপড়া তো জানতই, আর তা ছাড়াও সব রকম হাতের কাজ জানত ও সুন্দর ছবি আঁকতে পারত। একদিন নূরজাহান একাকী প্রাসাদের বাইরে বেড়াতে গেল। এক নির্জন জায়গায় এসে সে দস্যুদের হাতে ধরা পড়ল। তাকে উটের পিঠে চড়িয়ে তারা দামেস্ক নগরের দিকে চলল।

• সেই পথের উল্টো দিক দিয়ে আসছিল এক ধনী ব্যবসায়ীর ছেলে, তার নাম সেলিম। এই প্রথম বার সে দামী দামী মাল উটের পিঠে চড়িয়ে ব্যবসা করতে যাচ্ছিল।



যেতে যেতে ভাবছিল তার বাবার কথাঃ-

• শোন বাবা, ব্যবসায়ী হতে গেলে দয়ালু হলে চলবে না। শক্ত ও কৃপন না হলে কেউ টাকা লাভ করতে পারে না। বুঝলে তো? সম্পদ বেড়ে গেলে তুমি কিছুটা দয়া দেখাতে পার, তার আগে নয়, বুঝলে?

• জ্বি আব্বা।

• আর তুমি তাদের আক্রমন করে রাজকন্যাকে উদ্ধার করেছ!

• আমাদের চাকররা তাই করতে চেয়েছিল, আমি নিষেধ করেছি। তারা রাজকন্যাকে মেরে ফেলত। শুধু তার লাশ পাওয়া যেত।

• তাহলে কি করে তাকে উদ্ধার করলে?

• তাদের হাতে সমস্ত মাল ছেড়ে দিতে হল।

• মানে... আমার সারা জীবনে জমানো টাকা তুমি ঐ মেয়েটার পিছনে খরচ করে ফেললে?

• আমি... শোধ করে দেব আব্বা।

• সৎ মানুষ হলে তো করবেই। তবে হ্যাঁ... ঋন শোধ না করা পর্যন্ত আমার বাড়িতে পা দেবে না!... তোমরা যেতে পার!





সেলিম বাড়ি থেকে বের হয়ে গেল। রাজকন্যার সঙ্গে নদীর তীরে গিয়ে বসল। তার চোখে পানি। তার মনে হচ্ছিল যেন বাবা মারা গেছে। অনেক্ষণ মাথা নিচু করে বসে রইল, রাজকন্যা যেন তার চোখের পানি দেখতে না পায়। হঠাৎ চোখ তুলে দেখল, রাজকন্যা তার দিকে চেয়ে আছে। তার মুখে হাসি।সে কি! তুমি হাসছ? আমাদের অবস্থা দেখছ না? কি করে বাঁচব? সে চিন্তা পরে হবে। আজ আমরা বেঁচে আছি সেলিম, তাই হাসছি। আর একটা কারণ আছে... শুনবে?

• বল।

• সেলিম, অনেক রাজপুত্র আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছে, তবে কেউ

৪৩৫। অপব্যয়ী ব্যবসায়ী ২

তারা নদীর ধারে বসে ছিল। উঠবার আগে নূরজাহান বলল,

• এক মিনিট নদীর দিকে চেয়ে বসে থাক, তোমার ছবি আঁকব.....



• এ বার দেখ...

• বাঃ কি সুন্দর ! আর কি দ্রুত!

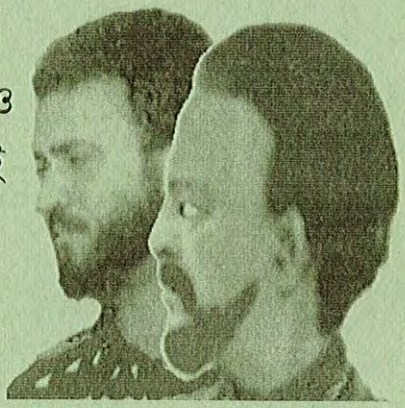
• দেখলে তো, আমি এই ধরনের ছবি আঁকতে পারি। বিক্রি করলে আমরা বেঁচে যাব।

• এক সপ্তা কেটে গেল। একদিন দু'জন ধনী লোক বাজারে এল। ছবি দেখে থেমে গেল।

• মালেক, ঐ ছবি কয়টা দেখ তো? অবিকল আমাদের রাজকন্যার ছবিগুলোর মত।

• তাই তো! আচ্ছা ভাই, এই ছবির দাম কত?

• ছবির দাম অনেক, তবে এই বাজারে আমরা খুব সস্তায় বেচি, একশ-দুশ টাকা।



• আচ্ছা আমরা সবগুলো নেব... তবে আরও দুটি আমাদের কেনার কথা ছিল, আজকেই এঁকে দিতে হবে। পারবে?

• তাহলে আমাদের বাসায় আসতে হবে।

• তারা সেলিমের পিছু পিছু হাটতে লাগল। সেলিম কিন্তু লক্ষ্য করেনি যে তাদের পিছনে আরও দশজন শক্তিশালি লোক হেটে আসছিল। এসে তারা চুপি চুপি সেলিমের বাসাটা ঘিরে ফেলল। তারা ছিল বাগদাদের খলিফার লোক। মালেক ঘরে এসে রাজকন্যাকে সালাম দিল।

• রাজকন্যা, সালাম নেবেন।





তোমার স্ত্রী চলে গেল কেন?



• ওর বাবা বাগদাদের খলিফা। জোর করে নিয়ে গেছে।

• জোর করে! তাহলে সেও ফিরে আসবে, কোন সন্দেহ নেই।

• কিন্তু আমার দেরী সয় না ভাই, তাকে আমার ফিরে পেতে হবে।

• তাহলে চল, আমি পথ চিনি, পথে ভিক্ষা করে খাব।

• তুমি আমাকে সাহস ফিরিয়ে দিলে ভাই। তুমি আমার বন্ধু। আজ থেকে আমাদের কপালে যাই থাক, দু'জনে ভাগ করে নেব, চল।

• কয়েকদিন পর তারা অনেক কষ্টে রাজবাড়িতে এসে পৌঁছল। সেখানে পেটে-ভাতে মালিদের কাছে কাজ পেল। একদিন মালিরা একটা ফুলধানি রাজকন্যার ঘরে নিয়ে যেতে বলল। সেলিম রাজকন্যার ঘরে ঢুকবার আগে নিজের কাপড় পরল। মেয়েটির আনন্দ আর ধরে না।

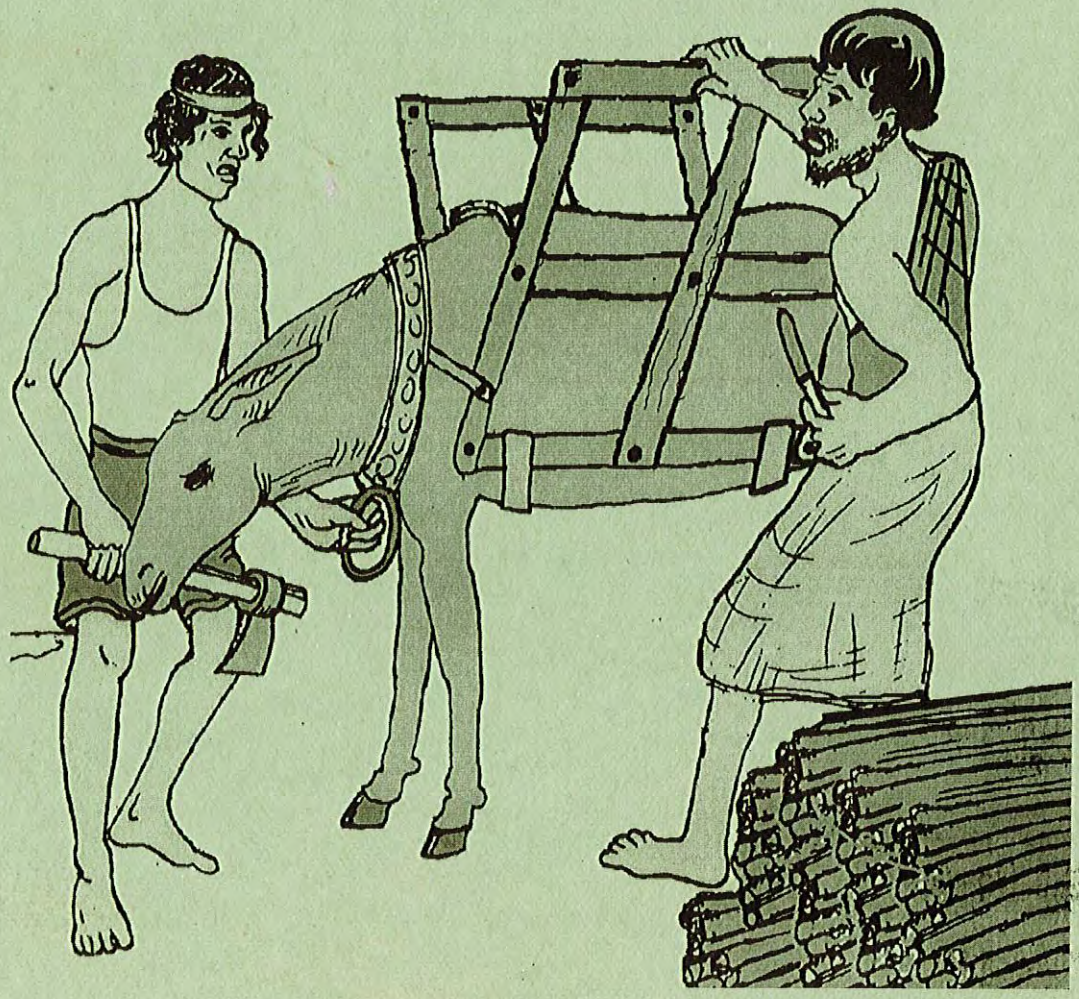
• সেলিম! কি আনন্দ! সেদিন থেকে আমার আর ঘুম নেই ... চল, রাত পর্যন্ত ঐ ঘরে লুকিয়ে থাকবে। রাতে আমরা পালিয়ে যাব। আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি।

রাতের ঘোর অন্ধকারে তারা রওনা হল। আনন্দে উল্যাসে তারা তিন

৪৩৬। অতি চালাকের গলায় দড়ি

খলিফা হারুণের আমলে বাগদাদ নগরে এক বিখ্যাত নাপিত ছিল, তার নাম রুস্তম। চোখ বন্ধ করেও সে চুল-দাঁড়ি কামাতে পারত। তবে সে যত দক্ষ তত চালাক ও অহংকারী ছিল।

• একদিন এক কাঠুরে গাধার পিঠে এক বাক্স কাঠ চড়িয়ে তার কাছে



• চুক্তি ছিল আমার সাথীর চুল-দাঁড়ি কামাবে। এই আমার সাথী। তার চুল-দাঁড়ি কামাতে হবে। রুস্তম তার কথা উড়িয়ে দিল। কাঠুরে খলিফার কাছে নালিশ করল। খলিফা রুস্তমকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল,

• কি চুক্তি ছিল তোমাদের ?

• চুক্তি ছিল তার ও তার সাথীর চুল-দাড়ি কামাব, কিন্তু আমি বলতে চাইনি যে আমি তার গাধার লোম কামাব। খলিফা উত্তর দিল,

• বলতে চাওনি কিন্তু বলেছ। চুক্তি করার সময় মুখের কথাই হল আসল। মনের মধ্যে কি আছে না আছে তা কেউ দেখতে যায় না।

•



৪৩৭। অতিথি সেবা

মহানবী একদিন নিজের ঘরে বসে আছেন, এমন সময় এক পথিক তার তাবুঁর সামনে এসে দাঁড়াল। সারা দিন হেঁটে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেছে। বলল, দয়া করে আমাকে এক



গ্লাস পানি দাও। মহানবী তাকে স্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর স্ত্রী বললেন, আমি দুঃখিত, ঘরে পানি ছাড়া আর কিছু নেই। সেই সময় মহানবীর কাছে তালহা নামে এক লোক বসেছিল। সে বলল, হুজুর, আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আমি আপনার অতিথির সেবা করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব।

তালহার কথা শুনে মহানবীর মুখে হাসি ফুটল। হাত তুলে তাকে দোয়া করে বললেন, বেশ, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক।

অতিথীকে নিয়ে তালহা বাড়ি গেল। তাকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে বলে সে স্ত্রীর কাছে গিয়ে বলল,

- আজ দু'দিন লোকটার পেটে দানাপানি পড়েনি। ঘরে কিছু খাবার আছে কিনা দেখ তো ? তার স্ত্রী বলল,
- ছেলেমেয়েদের খাবার ছাড়া ঘরে আর কিছু নেই।
- ইনি মহানবীর অতিথি, যেভাবে হোক তাকে খাওয়াতে হবে।

• ছেলেমেয়েদের না হয় কিছু মুখে দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা যাবে। কিন্তু এখানকার নিয়ম অনুসারে অতিথীর সঙ্গে আপনাকে খেতে বসতে হবে... অথচ দু'জনের জন্য ঘরে খাবার নেই। আপনি কি... খাওয়ার ভান করতে পারবেন ?

• তা পারব, কিন্তু ওর চোখ আছে তো, দেখতে পাবে না ?

• দেখতে পাবে না। তেল ফুরিয়ে যাবে, বাতি নিভে যাবে।

• বিবি, আমার সম্মান বাঁচালে। তোমার মত বুদ্ধিমতী বিবি এই দেশে আর নেই।

তালহা অতিথীর সঙ্গে খেতে বসল। তার স্ত্রী অতিথির জন্য খাবার নিয়ে আসল। তারপর বাতি নিভিয়ে দিল। তালহা খাওয়ার ভান করতে লাগল। অতিথী পেট ভরে খেয়ে শুতে গেল।



পরদিন মহানবী ব্যাপারটা জানতে পেরে তাদের বললেন, আল্লাহ তোমাদের মঙ্গল করুন ও তোমাদের এই বুদ্ধি টিকিয়ে রাখুন।

৪৩৮। রাস্তার দুই পাশে

শহরের মধ্য দিয়ে একটা রাস্তা চলে গিয়েছে। বড় রাস্তা। রাস্তার দু'পাশে মুখোমুখি দু'টি বাড়ি। একটা ছিল রাজপ্রাসাদ আর একটা জেলে বাড়ি। ১লা বৈশাখে রাজবাড়িতে জন্ম নিল এক ছেলে, চাঁদের মত মুখ। তার নাম রাখা হল চাঁদ। সেই একই দিনে জেলের বাড়িতে জন্ম নিল একটি মেয়ে, ফুলের মত সুন্দর। তার নাম রাখা হল মালা। প্রত্যেক ১লা বৈশাখে রাজা তার ছেলের জন্মদিন পালন করত। তখন জেলেটির মনে পড়ত আজ মালার জন্মদিন। তখন সে তাকে বাদাম ভাজা কিনে দিত।

চাঁদ বড় হতে লাগল। তার বয়স যখন পাঁচ বছর হল তখন একদিন রাস্তার ওপাশে গিয়ে মালাকে দেখতে পেল। মালা চাঁদকে একটা বাদাম খেতে দিল। চাঁদ বাদাম খেয়ে জিজ্ঞাসা করল, বড় হয়ে আমাকে বিয়ে করবে ? মালা বলল, না, তুমি হাসতেও জান না, খেলতেও জান না, তোমাকে নিয়ে আমি কি করব ? সেদিন থেকে চাঁদ রাস্তা পার হয়ে অন্যান্য শিশুদের মত হাসাহাসি ও খেলাধুলা করতে শিখল। তখন মালা



তার এক বুড়ির সাথে দেখা হল। তার ঘাড়ে এত বড় বোঝা যে, হাটতে পারছিল না। মালা সেই বোঝাটা বুড়ির বাড়িতে বয়ে নিয়ে গেল। বুড়ি বলল, কি পুরস্কার চাও ? মালা হেসে বলল, খালাম্মা, দোয়া কর, আমি আর কিছু চাই না। বুড়ি বলল, এই রুটি, এই তেলের শিশি আর এই ফিটকিরির টুকরো নিয়ে যাও। মালা এসব পকেটে পুরে বনে ঢুকে গেল। হঠাৎ একটা বাঘ তাকে আক্রমণ করল। মালা রুটি বের করে তার মুখে ফেলে দিল। বাঘ শান্ত হল। এবার মালা লাল নদীতে পৌঁছলো। ঘাটে নৌকা নেই। সে নদীতে ফিটকিরি ফেলে দিয়ে বলল, সুন্দর নদী পথ ছাড়। তার পানি ঝর্ণার মত স্বচ্ছ হয়ে গেল। তখন নদী হেসে বলল, কেউ কোনদিন আমাকে সুন্দর বলেনি। সে দুইভাগ হয়ে গেল। তার মাঝখান দিয়ে মালা ওপারে চলে গেল। হাঁটতে হাঁটতে মালা নীল পরীর প্রাসাদে পৌঁছলো। দেখলো ফটকের কব্জায় জং ধড়ে গেছে। মালা কব্জার ভিতরে তেল ঢেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। নীল পরী ঘুমাচ্ছিল তার সোনার পালঙ্কে। মালা তার একটা চুল তুলে নিয়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু চুল ছিড়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নীল পরীর ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। সে রাগ করে বলল, দরজা বন্ধ হও। কিন্তু দরজা বলল, না, সে আমার কব্জায় তেল দিয়ে চালু করে দিয়েছে। তখন নীল পরী নদীকে বলল, তাকে ডুবিয়ে দাও। নদী বলল, না, সে আমাকে স্বচ্ছ করে দিয়েছে। এবার নীল পরী বাঘ ডেকে বলল, এক্ষুণি ওকে খেয়ে ফেল। বাঘ বলল, না, সে আমাকে রুটি খেতে দিয়েছে।

এভাবে মালা নীল পরীর চুলটা নিয়ে ফিরে এল। ফকির চাঁদের হাতে চুলটা বেঁধে দিল। সঙ্গে সঙ্গে চাঁদ সুস্থ হয়ে গেল।

৪৩৯। শেফালীর জালী

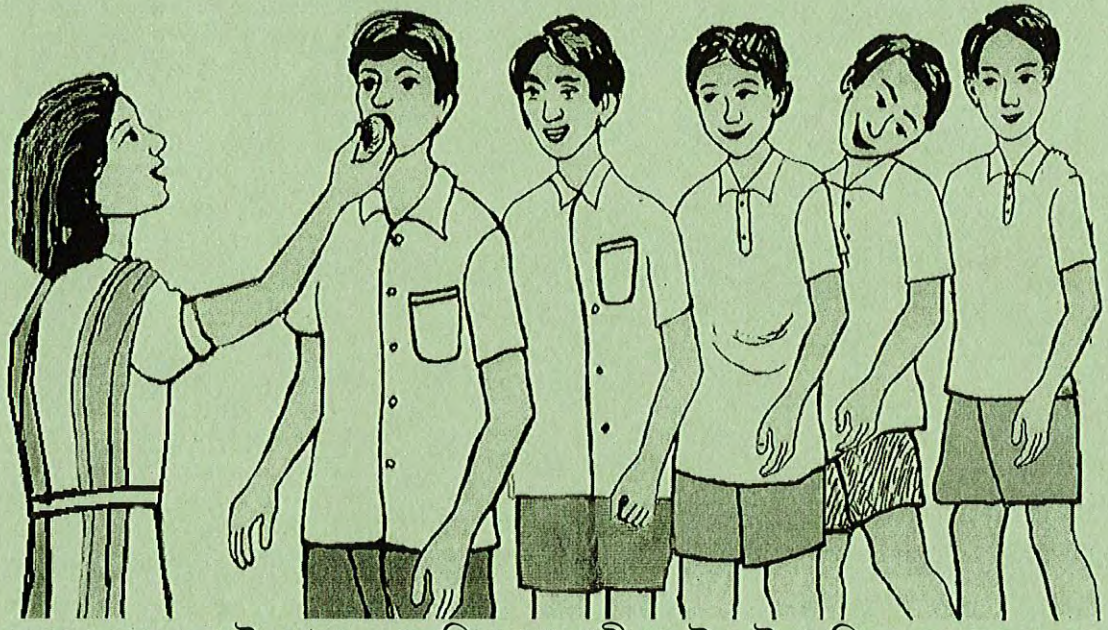
এই বছরে শেফালী স্কুল পাল্টিয়েছে। পাড়ার বাইরে গ্রামের পাশে হাইস্কুলে যাবে। তাকে ক্লাশ ফোরে ভর্তি করা হয়েছে। শেফালী খুব খুশি। ক্লাশ ফোরের আপা তার আপন খালাম্মা। শেফালীকে সে আদর করে। এজন্য অবশ্য অন্যান্য ছেলেমেয়ে তাকে হিংসা করে।



দ্বিতীয় দিন শেফালী কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে এল। এসে মায়ের কোলে উঠে ফুঁপাতে লাগল।

- মা, স্কুলে কেউ আমাকে ভালবাসে না।
- কি করে বুঝলে ?
- একটা ছেলে আমাকে বলল, শেফালী, শেফালী, তোর মুখে কালি। তখন সবাই ধরেছে, শেফালী, শেফালী, তোর মুখে কালি...মা, আমি কি কালো ?
- কখনও না, তোমার মত শ্যামলা, সুন্দরী মেয়ে কি আর আছে ? ওরা শুধু শুধু ঠাট্টা করেছে তোমাকে রাগানোর জন্য। তুমি রাগ করেছ, না ?
- রাগ করব না ? খুব রাগ করেছি!
- সেজন্য ওরা মজা পায়। শোনো, আমি জানি কি করতে হবে। ওদের খেলা পাল্টাতে হবে।

তোমরা বলবে, শেফালী, প্লিজ্ আমার জালি। শেফালী হাড়িটা হাতে নিয়ে হাসতে হাসতে জালিটা প্রত্যেকের মুখের ভিতর ঢুকিয়ে দিতে লাগল। সবাই হাসতে হাসতে জালিটা খেয়ে ফেলল, আর বার বার শেফালীর দিকে চেয়ে হাসতে লাগল। সেদিন থেকে ছড়া পাল্টে গেল। এখন আর কেউ বলে না, শেফালী, তোর মুখে কালি। বরং শেফালীকে
দেখে বলে, শেফালী, প্লিজ, আমার জালি। ঠাট্টা ফুরিয়ে গেছে, হাসি ফুরায়নি, এখন সবাই শেফালীর বন্ধু।



কয়েক বছর কেটে গেল। একদিন শেফালী সেই ঘটনা নিয়ে মায়ের সঙ্গে আলাপ করছিল। শেফালী বলল, মা, কোন মিষ্টির দোকানে জালি নেই কেন? মা বলল, সেদিন আমরা দু'জনে যা তেরী করেছিলাম তার নাম জালি, কারণ তোমার নামের সঙ্গে মিলে যায়। তাছাড়া কিন্তু জালি বলতে জগতে কিছু নেই।
শেফালী হেসে বলল, মা, তোমার যে এত বুদ্ধি, আমি তা জানতাম না।

৪৪০। দৈত্যের কাছে শুকতারা



এক ছিল মস্ত বড় ব্যবসায়ী ও তার কন্যা। মেয়েটির নাম শুকতারা। শুকতারা খুব সুন্দরী ও খুব সরল। সে বাবাকে খুব ভালবাসত। একদিন বাবা খবর পেল যে, তার একটা জাহাজ বন্দরে এসে গেছে, তাই সেদিকে রওনা হল। যাবার সময় মেয়েকে জিজ্ঞাসা করল,

– তোমার জন্য কি উপহার নিয়ে আসব ?

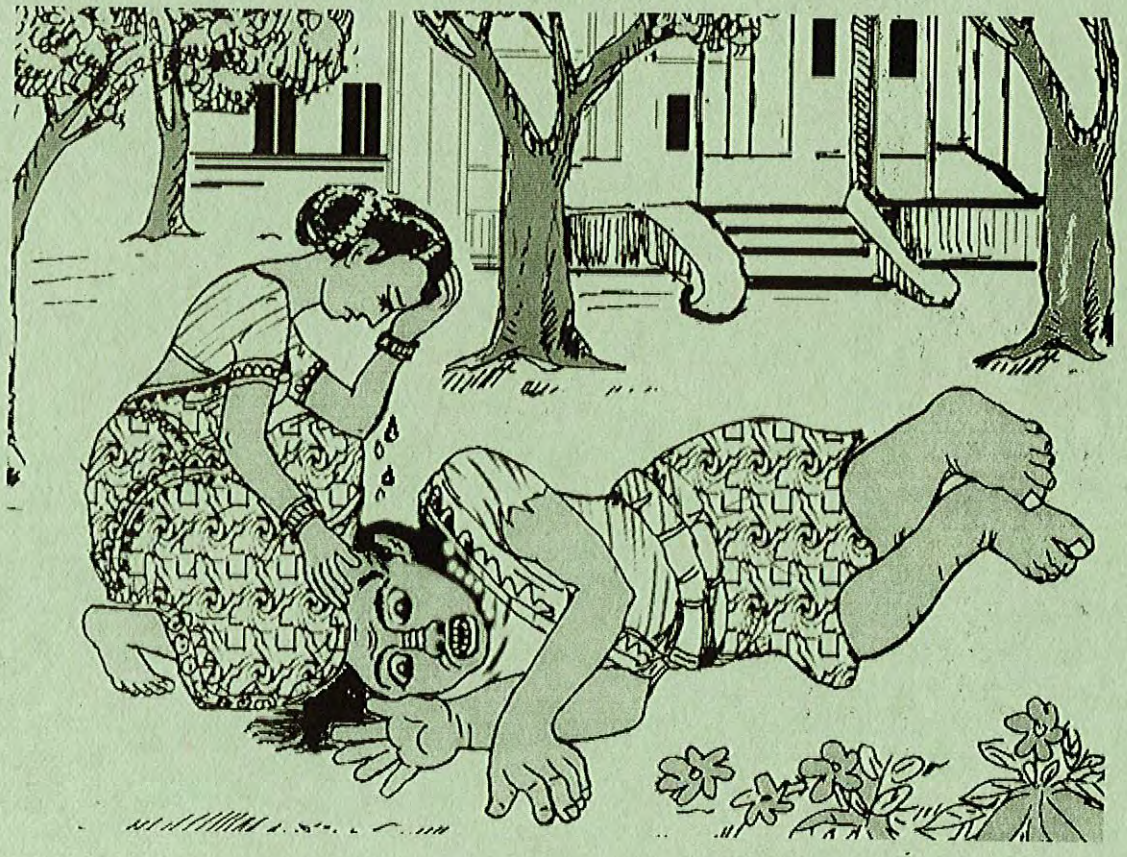
– একটা গোলাপ। শুকতারা হেসে বলল।

বাড়ি ফিরে আসার পথে বাবা একটা বনের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলল। রাত হয়ে যাচ্ছিল, সে খিদে ও ভয়ে মরে যাচ্ছিল। সৌভাগ্য যে, বনের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ সুন্দর এক প্রাসাদ দেখতে পেল। সে ভিতরে প্রবেশ করল। অবাক হয়ে দেখল, ভিতরে কেউ নেই, তবুও অতিথির জন্য খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করা আছে। সে খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। সকালে উঠে কাউকে দেখতে পেল না। সে চলে যাচ্ছিল, এমন সময় বাগানের মধ্যে একটা গোলাপ দেখতে পেল। তখন তার মনে পড়ল মেয়েটার উপহারের কথা এবং গোলাপটা তুলে নিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়ানক সুর শুনতে পেল,

– থাম। এই গোলাপের মত মূল্যবান জিনিষ আমার কিছু ছিল না, তুমি সেটা মেরে ফেলেছো। তোমাকে মরতে হবে।

যে লোকটা এগিয়ে এল তার মত কুৎসিত ও ভয়ানক মানুষ সে জীবনে

পেয়ে সে দঃখে মরতে বসেছে। শুকতারা দৈত্যকে বলল, আমার যেতে হবে। দৈত্য বলল, যেতে পার, তবে তুমি এক সপ্তার মধ্যে না ফিরলে আমি মরে যাব। শুকতারা যাত্রা করল। বাবার সেবাযত্ন করল। কতদিন গেল তার হিসাব রাখল না। একদিন দৈত্যের সাদা ঘোড়াটি এসে হাজির হল। তার গলায় একটা চিঠি। শুকতারা চিঠিটা পড়লঃ- আমার প্রাসাদ তোমার থাকল, আমি মরে যাচ্ছি। শুকতারা সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার পিঠে চড়ে ফিরে গেল। দৈত্য বাগানের মাঝে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। তার চোখের পানিতে মাটি ভিজে গিয়েছিল।



শুকতারা এই প্রথম বার দেখতে পেল তার দু'চোখ কত সুন্দর ও মায়া ভরা। দেখে সেও কাঁদতে লাগল। তার চোখের পানি পড়ল ঐ বিশ্রী কুৎসিত মুখের উপর...। তখন সেই মুখের আকার হঠাৎ পাল্টে গেল,